ভাই গিরিশচন্দ্র সেন

১৮৩৪-১৯১০

আবুল আহসান চৌধুরী

বাংলা একাডেমী ঢাকা

জীবনী গ্রন্থমালা

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৯৭১

পাণ্ডুলিপি : গবেষণা উপবিভাগ

প্রকাশক : শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রচ্ছদ : সমর মজুমদার

মুদ্রণ : ওবায়দুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

মূল্য : পনেরো টাকা মাত্র ॥ দেড় মার্কিন ডলার

JIBANI GRANTHAMALA : A series of literary biographies

প্রসঙ্গ-কথা

সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্যে কবি সাহিত্যিক প্রাবন্ধিকদের প্রামাণ্য জীবন-কথা অপরিহার্য উপাদান হিসাবেই বিবেচিত। বাংলা সাহিত্যের গবেষক ও ইতিহাস রচয়িতাদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই বাংলা একাডেমী কর্তৃক 'জীবনী গ্রন্থমালা' শীর্ষক যে প্রকল্প গৃহীত হয়েছে তার পূর্ণ বাস্তবায়ন, আমাদের বিশ্বাস, এ-ক্ষেত্রে অনুভূত দীর্ঘদিনের শূন্যতা, অংশত হলেও, পূরণ করবে। বাংলা ভাষার এক শ' জন বিশিষ্ট লেখকের জীবনী এই প্রকল্পের অধীনে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে। গত দু'বছরে ষাট জন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক সংবাদিকের জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এবার একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা-আন্দোলনের অমর শহীদদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে বাংলা একাডেমীর সশ্রদ্ধ নিবেদন আরো তেত্রিশ জন স্মরণীয় সাহিত্যশিল্পীর জীবনালেখ্য।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেনই সর্বপ্রথম কোরান শরীফকে ভাষান্তরিত করে সাক্ষর বাঙালীর হাতে তুলে দেন। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যায় ডিগ্রিধারী ছিলেন না, অথচ আরবি-ফার্সি-সংস্কৃত-বাংলায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মনস্বিতা, ব্যক্তিগত চরিত্রমাধুর্য, আদর্শবাদ, মানবতাবোধ ও সমাজহিতৈষণা প্রভৃতি গুণের সমন্বয়ে তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়। কবিতা, জীবনীগ্রন্থ, ধর্মকথা ও ধর্মব্যাখ্যা—সাহিত্যের এই শাখাচতুষ্টয় তিনি তাঁর ধীশক্তি ও কল্পনাবেগ দ্বারা পরিপুষ্ট করে গেছেন। তবুও, সবার উপরে তাঁর অক্ষয় অবদান—তিনি আমৃত্যু সামাজিক ও ধর্মীয় মৈত্রীর অন্যতম উদগাতা ছিলেন।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণশীল এই স্মরণীয় লেখকের তথ্যবহুল জীবনী সংকলন করেছেন জনাব আবদুল আহসান চৌধুরী।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকল সহকর্মীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

সূচী

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন

জীবন-কথা

উনিশ শতকের আর্থ-সামাজিক রাজনীতিক প্রেক্ষাপটে জাতিগত স্বাতন্ত্র্য-চিন্তার সূত্র ধরে বাঙালীসমাজে ধর্মবিদ্বেষ ও জাতিবৈর মনোভাব বিশেষ মদদ লাভ করে। ফলে বাঙালীসমাজের প্রধান দুটি সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের সামাজিক সৌহার্দ বিনষ্ট হয় ও মানসিক দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। এই দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক জানা বা বোঝার তেমন কোনো সুযোগ ছিলোনা। রাজনীতিক প্রয়োজনে কখনো কখনো এই দুই সম্প্রদায়ের একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা হলেও, ধর্মীয়-সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তা অনুশীলিত হয়নি।

সনাতন হিন্দুধর্ম থেকে বেরিয়ে এসে হিন্দু সম্প্রদায়ের যে-অংশ একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তনা করেন, তাঁরা ধর্ম-সমন্বয়, পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সম্প্রদায়-সম্প্রীতির বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। এই চিন্তা কার্যকর করতে গিয়ে তাঁরা বিশেষ করে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) পরিচালিত 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ', পরম আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে একেশ্বরবাদী ধর্মসমূহের প্রতি মনোযোগী হন। তাঁরা ভিন্ন ধর্মের শাস্ত্র ও ধর্মীয় মনীষীদের জীবনচর্চার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে পরধর্মের প্রতি এই সশ্রদ্ধ অনুরাগ এবং ভিন্নধর্মের শাস্ত্র ও মনীষী-জীবন থেকে অনুকরণীয় সদ্‌গুণাবলীর অনুশীলন ও তা প্রচারের তাৎপর্য ছিলো দূরপ্রসারী।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে ইসলামী ধর্মশাস্ত্র ও মুসলিম ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব-সাধু-সন্তদের জীবনচরিত অনুবাদের মাধ্যমে ব্রাহ্মধর্মানুসারী তথা বৃহত্তর বাঙালীসমাজের কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়ার উদ্যোগ গৃহীত হয়। বলাবাহুল্য যে এই প্রয়াসের ফল শুভ ও কল্যাণকর হয়েছিল। এর মাধ্যমেই এই দুই সম্প্রদায়ের মাঝখানের বন্ধ জানালা কিছুটা খুলে গিয়েছিল। এই প্রয়াসের ফলে মুসলমান সমাজও অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙলাভাষায় ইসলামী শাস্ত্রচর্চার প্রয়োজন অনুভব করেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০) ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের এই উদ্যোগের স্মরণীয় পথিকৃৎ ও

প্রধান রূপকার। ইসলামী শাস্ত্র সম্পর্কে ব্রাহ্ম বা হিন্দুর মনে ঔৎসুক্য ও মুসলমানের মনে প্রেরণা জাগানোর কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। তাই গিরিশচন্দ্রের জীবন ও কর্মের মূল্যায়নের তাৎপর্য বহুমাত্রিক।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

গিরিশচন্দ্র সেন ১৮৩৪ সালের এপ্রিল অথবা মে মাসের (বৈশাখ ১২৪১) কোনো এক মঙ্গলবারে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার রূপগঞ্জ থানার অন্তর্গত মহেশ্বরদী পরগণার অধীন পাঁচদোনা গ্রামের এক প্রসিদ্ধ দেওয়ান বংশে জন্মগ্রহণ করেন।[১] জাতিতে তাঁরা বৈদ্য, আর ধর্মাচরণে শাক্ত। পিতা মাধবরাম সেন ও মাতা জয়কালী দেবীর তিনপুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। গিরিশচন্দ্রের দুই ভাইয়ের নাম যথাক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র ও হরচন্দ্র। হরচন্দ্র 'সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ কবি ও পাণ্ডিত' ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সংস্কৃতভাষায় অনেকগুলো কাব্য রচনা করেন, তার মধ্যে 'কৃষ্ণলীলা' প্রকাশিত হয়েছিল। এ-ছাড়া সংস্কৃতে তিনি ব্রহ্মস্তোত্রও রচনা করেন। দাদা হরচন্দ্রের কিছু প্রভাব গিরিশচন্দ্রের জীবনে পড়েছিল।

গিরিশচন্দ্রের পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম যথাক্রমে রামমোহন ও ইন্দ্রনারায়ণ। এঁদের কৌলিক পদবী 'সেন' এবং মোগল সুবাদারের নিকট থেকে 'রায়' উপাধি লাভ করেন। তাই পদবী হিসেবে তাঁরা 'সেন', 'রায়' বা 'সেনরায়' ব্যবহার করতেন।[২]

এই দেওয়ান বংশের পূর্বপুরুষদের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের বৃদ্ধ প্রপিতামহ দেওয়ান দর্পনারায়ণ রায়ই ছিলেন সর্বাধিক খ্যাতিমান। তিনি নবাব আলীবর্দী খাঁর (১৬৭৬-১৭৫৬) সময়ে মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গিরিশচন্দ্র জানিয়েছেন:

> তিনি অত্যন্ত বদান্য ও দয়ালু লোক ছিলেন, জনহিতকর নানা সৎকার্য্য করিয়া স্বদেশে অতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। অতীব পুণ্যাত্মা বলিয়া লোকে তাঁহাকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার প্রভাবেই আমাদের বংশের গৌরব ও সম্মান।[৩]

গিরিশচন্দ্রের পিতামহ মুনশী রামমোহন রায়ও মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে চাকুরী করতেন। রাধানাথ, মাধবরাম ও গঙ্গাপ্রসাদ—তাঁর এই তিন পুত্রেরই

জন্ম মুর্শিদাবাদে। উত্তরকালে এঁরা 'পারস্যভাষাবিদ্' হিসেবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। এই দেওয়ান পরিবারে ফারসী ভাষার বিশেষ সমাদর ও চর্চা ছিলো। গিরিশচন্দ্রের জবানীতে জানা যায়:

> পিতামহ রামমোহন রায় পারস্যভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিলো। আমার পিতামহ, পিতা ও পিতৃব্য সকলেই (খোশনবিস) ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য রাধানাথ রায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার পারস্যলিপির আদর্শের (তালিমের) অনুকরণে সুন্দর লিখিবার জন্য দেশ-দেশান্তরের লোক তাহা গ্রহণ করিত। সাধারণতঃ পারস্য বর্ণমালা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। "শেকস্ত" ও "নোস্তালিক"। পিতামহদের এবং পিতৃব্য রাধানাথ রায় শেকস্ত লেখক ছিলেন। তাঁহাদের অক্ষরাবলী মুক্তাবলীর ন্যায় নয়নরঞ্জন সুন্দর ছিল। পিতৃদেব এবং পিতৃব্য গঙ্গাপ্রসাদ রায় নোস্তালিক অক্ষরে লিখিতেন। তাঁহাদের দুই-জনের এবং পিতামহ ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত অনেকগুলি পারস্য পুস্তক আমাদের গৃহে ছিল, আমার অযত্নে সমুদয় বিনষ্ট হইয়াছে।[৪]

গিরিশচন্দ্রের জন্মকালে তাঁর স্বগ্রাম পাচদোনার নৈতিক জীবন ও সামাজিক অবস্থা কেমন ছিলো তার আভাস তার আত্মচরিতে পাওয়া যায়:

> সেইসময় পাঁচদোনা গ্রামের অত্যন্ত দুরবস্থা ছিল, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে নীতির বন্ধন ছিল না, চরিত্রের সুদৃষ্টান্ত দুর্লভ ছিলো, আমি প্রায় কাহারও মুখে ভাল কথা—সদুপদেশ শুনিতে পাইতাম না। অধিকাংশ জ্ঞাতিকুটুম্ব পুরুষ ঘোরতর মদ্যপায়ী ছিল। আমি মদ্যপ্রিয় শাক্ত বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম।···আমি মাতালের সংসর্গে অনেককাল বাস করিয়াছি,··· আমার চরিত্রে নীতির বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হইয়াছিল।···সর্ব্বদা চতুর্দিকে কুকথা শ্রবণ ও কুদৃষ্টান্ত দর্শনের অভাব ছিল না। নানা কুভাব ও কুচিন্তায় অন্তর কলুষিত হইয়াছিল, চরিত্রের স্খলনও ঘটিয়াছিল।[৫]

গিরিশচন্দ্র গ্রামের সখীসংবাদ গানের দলের সঙ্গেও জুটেছিলেন। তিনি এই দলের একজন 'পৃষ্ঠপোষক' ও 'উৎসাহদাতা' ছিলেন। বলেছেন তিনি:

> আমি সমস্ত রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক উৎসাহ সহকারে গান শ্রবণ করিতাম, তাহাদের গান শিখিবার সময় গানের খাতা দেখিয়া গান বলিয়া দিতাম, তাহাদিগকে গাঁজাতামাকু যোগাইতাম।[৬]

গিরিশচন্দ্র তাঁর বাল্যকালের স্বভাব ও আচরণ কেমন ছিলো সে-সম্পর্কে লিখেছেন :

আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়া বাল্যকালে মার অধিকতর স্নেহ ও আদরের পাত্র ছিলাম। আমি যে বিষয়ের জন্য আবদার করিতাম, মা আমাকে তাহাই দিতেন। তিনি আমাকে নানা অলঙ্কারে সাজাইয়াছেন। আমার গলায় হার, হাতে বালা, বাহুতে বাজু নামক ভূষণ, কোমরে ঘুঙ্গুর বা গোট, পদে নূপুর ও মল ছিল। আমি মস্তকে শিখা অর্থাৎ টিকী ধারণ করিতাম, আদুল গায়ে থাকিতাম।...আমি যেন আদুরে গোপাল ছিলাম। তখন আমি অতিশয় ক্ষীণাঙ্গ দুর্বল ভীরু প্রকৃতির ছিলাম; দুষ্ট দুরন্ত বালকগণের সঙ্গে কখনও মিশিতাম না; প্রায় কোন খেলাই জানিতাম না। ক্রীড়ামোদের জন্য যেরূপ বুদ্ধিচাতুর্য্যের প্রয়োজন সে বিষয়ে আমি দরিদ্র ছিলাম। আমি গৃহে একাকী জীবনযাপন করিতাম।[৭]

বাল্যকালের এই স্বেচ্ছা-গৃহবন্দীত্বের কালে গিরিশচন্দ্রের অবসর সময় কাটতো তাঁদের গৃহে অবস্থানরত এক বৈদ্য চিকিৎসকের সাহচর্যে। তাঁর কাছে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা নানারকমের শ্লোক শিক্ষা করতেন গিরিশ। এ-ছাড়া উক্ত কবিরাজের অনুকরণে ঔষধ তৈরী করে গ্রামে কেউ অসুস্থ হলে তাঁকে তা বিতরণ করতেন। এই ছিলো গিরিশচন্দ্রের অন্যতম 'বাল্যক্রীড়া'। তবে তাঁর "বাল্যক্রীড়ার মধ্যে প্রধান ক্রীড়া ছিল ঠাকুরপূজা" এবং তার জন্যে প্রয়োজনীয় পূজাপোকরণও ক্রীত-সংগৃহীত হয়েছিল। তাঁর এইসব আকাঙ্ক্ষা পূরণের কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তাঁর মা।

গিরিশচন্দ্র আট বছর বয়সে পিতৃহীন হন। তাঁর মায়ের মৃত্যু হয় ১৩০৪ সালের ৩০ বৈশাখ ৯৪ বছর বয়সে। বিশেষ সমারোহে তিনি তাঁর মায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন করেন। এই উপলক্ষে কলকাতা ও ঢাকা থেকে ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ পাঁচদোনা গ্রামে এসেছিলেন। মায়ের মৃত্যুতে গিরিশচন্দ্র 'মাতৃবিয়োগে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস' নামে একটি ক্ষুদ্র মাতৃ-চরিত রচনা করেন এবং তা শ্রাদ্ধক্রিয়ার দিন পঠিত হয়। ১৩০৫ সালে মায়ের দেহভস্মের উপরে শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত সমাধিবেদিকা প্রতিষ্ঠা করেন। গিরিশচন্দ্র অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনগঠনে তাঁর মায়ের অবদান খুব বেশি। পরিণত বয়সেও মাতৃভক্তি হ্রাস পায়নি, 'মাতৃদর্শনোপলক্ষে'

বছরে দু-তিনবার বাড়ী গিয়ে কিছুদিন থাকতেন। মায়ের মৃত্যুতে শোক-বিহ্বল গিরিশ আবেগাপ্লুত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন:

> মা আমাদের পরিবারের ভূষণ ও গৃহের শোভা ছিলেন। মা আমার মস্তকের মণি, কণ্ঠের হার, তাঁহার চরণ হস্তের অলঙ্কার, মার আশীর্ব্বাদ আমার জীবনের সম্বল ছিল। লোকে বলে এমন বৃদ্ধা পরলোকে গিয়েছেন ভালই হইয়াছে, উহা শুনিতে আমার কষ্টবোধ হয়। আরও দশ বৎসর মা আমার নিকটে থাকিলে আমি সুখী হইতাম।[৮]

শিক্ষাজীবন

পাঁচ বছর বয়সে কুলগুরু বিশ্বনাথ পঞ্চাননের কাছে গিরিশচন্দ্রের বিদ্যাচর্চার হাতেখড়ি হয়। তাঁর বিদ্যাশিক্ষার সূচনাপর্বের যে-বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। বলেছেন তিনি:

> আমার স্মরণ আছে, তিনি সরস্বতী দেবীর পূজা করিয়া আমার হাতেখড়ি দিয়াছিলেন। খড়িমাটির ঢেলা দ্বারা ভূতলে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন-বর্ণ সকল লিখিয়া আমাকে একটি একটি করিয়া অক্ষর পড়াইয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে কদলীপত্রে বর্ণমালা লিপি করা অভ্যাস করিলে পিতৃদেব মাধবরাম রায় মহাশয় আমাকে পারস্যভাষার চর্চায় নিযুক্ত করেন। তাঁহার নির্দেশে একজন মোল্লা আসিয়া নমাজ পড়িয়া পারস্য বর্ণমালা আলেফ, বে, তে, সে ইত্যাদি পড়াইয়া যান। আমি সিন্নি দিয়া তাঁহার নিকটে রীতিপূর্ব্বক "বেসমাল্লা আর্ রহমান্ আর্ রহিম" বচন উচ্চারণ করিয়া আলেফ, বে, তে, পড়িতে ও লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। পারস্য বর্ণমালা কিঞ্চিৎ অভ্যস্ত হইলে পর পিতৃদেব স্বহস্তে শেখ সাদী প্রণীত 'পন্দনামা' পুস্তক লিখিয়া আমাকে পড়িতে দেন। বোধকরি সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রমকালে আমি রীতিপূর্ব্বক পারস্য-ভাষা শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হই।[৯]

পিতার তত্ত্বাবধানে গিরিশচন্দ্রের কিছু ফারসী চর্চা হয়, 'পন্দেনামা', 'গুলিস্তাঁ' জাতীয় পুস্তক পাঠ করেন। তবে ফারসী ভাষাশিক্ষার পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্যে অর্থ না বুঝে পাঠ আবৃত্তি ও মুখস্থ করা অর্থাৎ 'মতনপড়া'-র ফলে কার্যকর কোনো শিক্ষালাভ তার ঘটেনি, বরঞ্চ এইভাবে কয়েক বছর সময়

নিষ্ফল ব্যয় হয়। পাশাপাশি মাতৃভাষার চর্চা উপেক্ষিত হওয়ার ফলে তাঁর বাঙলা ভাষা-জ্ঞানও গড়ে উঠতে পারেনি। এই অবস্থায় গিরিশের আটবছর বয়সকালে তার পিতার মৃত্যু হয়। এরপরের অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

> পিতৃদেব স্বর্গগত হইলে পর আমি স্বাধীন হইলাম, পড়াশুনায় অধিকতর অনাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। একদিন সবক (পাঠ) গ্রহণ করিলে তিনদিনেও তাহা ইয়াদ (আবৃত্তি) করা হইত না। শাসনকর্ত্তা কেহ ছিল না, মার অত্যধিক স্নেহ ও আদরে আমাকে অধিকতর বয়ে যাইতে হইয়াছিল।[১০]

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর গিরিশচন্দ্রের অগ্রজ ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে সেকালের বিশিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পগোজ স্কুলে ভর্তি করে দেন, তখন তার বয়স ১২ বছর। কিন্তু এই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার মেয়াদ ছিলো খুবই স্বল্প। জানিয়েছেন তিনি :

> আমি এক পক্ষকাল উক্ত স্কুলে Spelling পড়িয়া থাকিব। প্রাত্যহিক পাঠে মাষ্টারবাবু ও পণ্ডিত মহাশয়কে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম। কিন্তু একদিন প্রধান শিক্ষক মহাশয় দুইতিনজন ছাত্রকে কোন অপরাধে আমার সম্মুখে অত্যন্ত বেত্রাঘাত করেন, তাহা দেখিয়া আমার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আমি ভাবিলাম, হয়তো একসময় এরূপ গুরুতর দণ্ডে আমাকেও দণ্ডিত হইতে হইবে। ইহা ভাবিয়া আর ইংরাজি স্কুলে পড়িব না, আমি এই স্থির করিলাম।[১১]

এরপর তিনি আর এই স্কুলে যাননি। এ-বিষয়ে অগ্রজের নির্দেশ-উপদেশ মান্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেবল যে বেত্রদণ্ডের ভয়েই তিনি স্কুল ত্যাগ করেছিলেন তা নয়, স্বাধীনচারী গ্রাম্য-বালক গিরিশচন্দ্রের পক্ষে "স্কুলগৃহের একস্থানে একাসনে ক্রমাগত পাঁচঘণ্টাকাল স্থিরভাবে" বসে থাকাও সম্ভব ছিলো না। পগোজ স্কুলের ছাত্র হিসেবে ইংরেজীশিক্ষার যে সুযোগ ছিলো তা তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। অবশ্য এ-বিষয়ে তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ বা খেদ ছিলো না, বরঞ্চ একে তিনি বিধাতার আশীর্বাদ ও ইচ্ছা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। উত্তরজীবনে অবশ্য তিনি ইংরেজী-শিক্ষার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ফলপ্রসূ হয়নি।

পগোজ স্কুল ত্যাগের পর গিরিশচন্দ্র পুনরায় ফারসী চর্চা আরম্ভ করেন। ঢাকা শহরে কিছুদিন মুন্শী রুদ্রেশ্বর গুপ্ত ও পরে একজন মুসলমান মুন্শীর কাছে ফারসী শিক্ষা করেন। কিন্তু প্রণালীবদ্ধ শিক্ষার ভিত্তি না থাকায় ও মনোযোগী না হওয়ায় এই শিক্ষা ফলপ্রসূ হয়নি। কিছুকাল তিনি সুবর্ণ-গ্রামের হামছাদি পল্লীর নিকটবর্তী পিসেমশাই উমানাথ গুপ্তের বাড়ীতে থেকে তাঁর কাছে ফারসী শিক্ষা লাভ করেন।

গিরিশচন্দ্রের ঢাকাবাস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিছুদিন পরেই তিনি স্বগ্রাম পাঁচদোনায় ফিরে এসে একনাগাড়ে তিন-চার বছর বাস করেন। পাঁচদোনার লাগোয়া-গ্রাম শানখলায় কৃষ্ণচন্দ্র রায় নামে ফারসীভাষায় সুপণ্ডিত এক ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম প্রথম প্রতিদিন শানখলায় গিয়ে এবং পরে কিছুদিন কৃষ্ণ-চন্দ্রের বাড়ীতে থেকে ফারসী বিদ্যা শিক্ষা করেন। এখানে তিনি তওয়ারিখ জাঁহাগির, মাদনোজ্জ ওয়াহের, মহব্বতনামা, বহরদানেশ, সেকন্দরনামা, রোক্কাতে ইয়ার মোহম্মদ প্রভৃতি ফারসী কেতাব 'পূর্ণ বা আংশিক অধ্যয়ন' করেন। "পারস্য গদ্য-পদ্য কাব্যাদি পুস্তকের মর্ম্ম উপদেশনিরপেক্ষ" হয়ে পাঠ করে বুঝতে পারলেও "তখনও বাঙ্গলা বা পারস্য বচন বিন্যাস" করে শুদ্ধ দু-এক ছত্র বাক্যরচনা করার শক্তি আয়ত্ত হয়নি। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পঠন-পাঠন গিরিশচন্দ্রের ফারসী শিক্ষার একটি শক্ত ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছিল। ফারসী শিক্ষার জন্যে তিনি যে শানখলার কৃষ্ণচন্দ্র রায় ওরফে বাঁকা কৃষ্ণ রায়ের কাছে সর্বাধিক ঋণী সে-কথা তিনি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন।

এরপর গিরিশচন্দ্র তাঁর ছোটদাদা হরচন্দ্র রায়ের সঙ্গে ময়মনসিংহে গিয়ে বাস করতে শুরু করেন। হরচন্দ্র এখানে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার বৃত্তি অবলম্বন করেন। গিরিশচন্দ্র ময়মনসিংহের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কাজী মৌলবী আবদুল করিম সাহেবের কাছে 'রোক্কাতে আল্লামী' অধ্যয়ন করেন। ১৮/১৯ বছর বয়সে এই পর্যন্ত তাঁর ফারসী চর্চা হয়।

উপরিউক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারীতে গিরিশচন্দ্র নকলনবিশীর কাজে নিযুক্ত হন। এই কাজে কোনোরকম আয়-উন্নতিই তাঁর হয়নি, কেবল সহযোগীদের অনুকরণে কাজশেষে সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরার সময় অফিসের কালি ও কাগজ লেখাপড়ার জন্যে নিয়ে আসতেন। সেইসময় এই বিষয়টি 'অধর্ম্ম ও অনীতি' হিসেবে গণ্য করা হতো না বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

এইসময়ে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভগবানচন্দ্র বসুর উদ্যোগে ময়মনসিংহ শহরে একটি সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপিত হয়। গিরিশচন্দ্র নকলনবিশীর কাজে ইস্তফা দিয়ে উক্ত সংস্কৃত পাঠশালায় ভর্তি হন। গিরিশচন্দ্রের নিজের ভাষায় :

> প্রথমে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক প্রণীত উপক্রমণিকা ব্যাকরণ ঋজুপাঠ প্রথম ভাগ পড়িতে আরম্ভ করি। আমি ছাত্রগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলাম। আমার বুদ্ধি স্থূল, স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ, কেবল অভিনিবেশ ও অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম যত্নের গুণে আমি প্রাত্যহিক পাঠে পণ্ডিত মহাশয়কে সন্তুষ্ট করিয়াছি, অল্পদিনের মধ্যে সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।[১২]

এরপর তিনি ছোটদাদা হরচন্দ্রের কাছে কিছুকাল সংস্কৃতচর্চা করেন। তিনি কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, বাল্মীকি রামায়ণ, অভিজ্ঞান শকুন্তলা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের চর্চাও এই সময় করেন।

হার্ডিঞ্জ বঙ্গবিদ্যালয় ময়মনসিংহের একটি বিশিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিলো। এই হার্ডিঞ্জ স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করে "শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য নর্ম্মাল শ্রেণী স্থাপিত হয়।" গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিকথায় জানা যায় :

> আমি বাঙ্গলা সাহিত্য ও ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদির কিছু কিছু আলোচনা করিয়া নর্ম্মাল শ্রেণীতে প্রবেশের পরীক্ষা দান করি। আমি গণিত জানিতাম না, কোন সহাধ্যায়ী গণিতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন এরূপ কার্য্য অনীতি ও অন্যায় বলিয়া বড় বোধ ছিল না, অনেককে এরূপ অনীতির পথ অবলম্বন করিতে দেখা গিয়াছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে প্রথমরূপে গণ্য হইয়াছিলাম।[১৩]

নর্মাল শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সমাপ্তি ঘটে। এরপর হার্ডিঞ্জ স্কুলের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়ে তাঁর কর্ম-জীবনের সূচনা হয়।

গিরিশচন্দ্র ১৮৭৬ সালে ৪২ বছর বয়সে আরবী ভাষা শিক্ষার জন্যে লক্ষ্ণৌ নগরে যান। উদ্দেশ্য ছিলো, আরবী ভাষা শিখে "মোসলমান জাতির

মূল ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণপাঠ করিয়া এস্লামধর্ম্মে গূঢ়তত্ত্ব অবগত" হওয়া। লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজের আনুকূল্য ও সহযোগিতায় প্রখ্যাত পণ্ডিত জ্ঞানবৃদ্ধ মৌলবী এহ্সান আলী সাহেবের কাছে আরবী ব্যাকরণ ও দিওয়ান-ই-হাফিজের পাঠ গ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতায় ফিরে জনৈক মৌলবীর কাছে এ-বিষয়ে কিছু শিক্ষাগ্রহণ করেন। এরপর ঢাকায় নলগোলা পল্লীতে প্রতিদিন মৌলবী আলিমুদ্দীন সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর কাছে আরবী ইতিহাস ও সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেন। এইভাবে আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের পর তিনি কোরআন শরীফ পাঠে প্রবৃত্ত এবং বঙ্গানুবাদে আগ্রহী হন।

গিরিশচন্দ্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। এক নাগাড়ে কোনো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করে বিশেষ কোনো চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হননি, এ-ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম নর্মাল শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। তিনি গৃহ-শিক্ষকের সহায়তায় আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, বাংলা ও সামান্য ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন। প্রথম চারটি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তির স্বাক্ষর পাওয়া যায়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করলেও তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তা বিদ্বদ্‌সমাজের স্বীকৃতি অর্জন করেছিল। তাই এ-কথা বলা হয়তো অসমীচীন হবে না যে গিরিশচন্দ্র ছিলেন একজন স্বশিক্ষিত ব্যক্তি।

গিরিশচন্দ্র চিরকাল সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে গেছেন। অত্যন্ত হিসেবি ও মিতব্যয়ী ছিলেন তিনি। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্তঃসারশূন্য বাবুয়ানার চির-বিরোধী ছিলেন তিনি। অত্যন্ত সাধারণ ও শাদাসিধেভাবে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেছেন। ছাত্রজীবনে স্বহস্তে রান্না করেছেন, সর্বনিম্ন মূল্যের কাপড়-জামা-জুতা-চটি ব্যবহার করেছেন, জলখাবারের জন্য বরাদ্দ থেকেছে সামান্য চিঁড়ে-মুড়ি-লাড়ু। তিনি বলেছেন:

> আমি কৃতবিদ্য পণ্ডিত হই নাই, গরিবানারূপে যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়াছি, চিরকাল গরিবানাচালে চলিয়া আসিয়াছি! আমি এক টাকা দেড় টাকার অধিক মূল্যের বিনামা বোধহয় কখনও চরণে স্পর্শ করি নাই, বাল্যকালে তিনচারি আনা মূল্যের তালতলার চটিজুতা ব্যবহার করিয়াছি। তাহাও প্রায় তোলা থাকিত, আমি সর্বদা এক আনা দেড় আনা মূল্যের কাষ্ঠপাদুকাই ব্যবহার করিতাম।...আমি ছাত্রীয় জীবনে সামান্য পিরাণ বা মির্জাই কখন কখন ব্যবহার করিতাম, সর্বদা নয়।

বিকালে জল খাওয়ার জন্য চিড়ে মুড়ি লাড়ু ইত্যাদি নির্দিষ্ট ছিল।... এখন ছাত্রগণ বাটি বাটি চায়ের জল পান করে, এবং সর্বাঙ্গে সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়া থাকে। এ সকল বিলাসিতার সঙ্গে আমার কখনও কোন সম্পর্ক ছিলনা, এখনও নাই।[১৪]

এইভাবে কৃচ্ছ্রসাধনার আদর্শবোধের ভেতর দিয়ে গিরিশচন্দ্রের ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়।

বিবাহ ও সংসারজীবন

১৮৫৬ সালে ঢাকা জেলার ঘোড়াশালের নিকটবর্তী ভাটপাড়া গ্রামের ব্রহ্মময়ী দেবীর সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের বিবাহ হয়। বিবাহকালে গিরিশ ও ব্রহ্মময়ীর বয়স ছিলো যথাক্রমে ২১/২২ ও ১২ বছর। বিবাহের পর স্ত্রীকে পাঁচদোনার গ্রামের বাড়ীতে রেখে তিনি ময়মনসিংহে ছোটদাদার কাছে গিয়ে প্রথমে লেখাপড়া ও পরে জীবিকার চেষ্টা করতে থাকেন। এরপর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়ার কারণে ময়ময়সিংহে গিরিশচন্দ্র যখন নানাভাবে বিপন্ন ও নিঃসঙ্গ তখন ব্রহ্মময়ী স্বামীর সান্নিধ্যে বসবাসের জন্যে বিশেষ আগ্রহ ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করায় তিনি তাঁকে কর্মস্থলে নিয়ে আসেন। কিন্তু ময়মনসিংহে আবাস-সংকটে তাঁকে সাময়িক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। পরে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক কালীকুমার গুহের সৌজন্য ও বদান্যতায় তাঁর বাড়ীর পাশে একখণ্ড পতিত জমিতে গৃহনির্মাণ করে গিরিশচন্দ্র সপরিবারে বাস করতে থাকেন। ব্রহ্মময়ীকে গিরিশ তাঁর যোগ্য কর্মসঙ্গিনী হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই:

দিনের কার্য শেষ করিয়া রাত্রে তিনি পত্নীকে শিক্ষা দিতেন ও নানা আলোচনা করিয়া পত্নীর জ্ঞান ও চিন্তার উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা করিতেন।[১৫]

স্ত্রী ব্রহ্মময়ী এক বছরের সামান্য বেশী সময় ময়মনসিংহে ছিলেন। এই সময়ে তিনি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। ব্রাহ্মধর্মানুসারীর স্ত্রী হওয়ার কারণে তাঁর সেবা-শুশ্রূষায় স্থানীয় কোনো স্ত্রীলোকের সাহায্যলাভের সম্ভাবনা না থাকায় গিরিশচন্দ্র ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের পরামর্শে স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় যান। বঙ্গচন্দ্রের আরমানীটোলার বাসায় গিরিশ-পত্নী একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। পক্ষকালের মধ্যেই নবজাতকের মৃত্যু হয় এবং ব্রহ্মময়ী মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুখে তিনি

অনেকদিন পর্যন্ত শয্যাশায়ী থাকেন এবং তাঁর শরীর "কঙ্কালমাত্র বিশিষ্ট হয়"। এই অবস্থায় ব্রহ্মময়ীর মা 'মাতৃস্নেহের আবেগে' তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে যান। মায়ের অক্লান্ত সেবা-যত্নে কিছুদিন পর ব্রহ্মময়ী আরোগ্য লাভ করেন।

ব্রহ্মময়ী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে গিরিশচন্দ্র পুনরায় তাঁকে গ্রীষ্মের ছুটিতে গিয়ে ময়মনসিংহে নিয়ে আসেন। এখানে ব্রহ্মময়ীর কালান্তক বসন্তরোগ হয়। গিরিশচন্দ্র সুষ্ঠু চিকিৎসা ও উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষার জন্যে অনেক কষ্ট স্বীকার করে স্ত্রীকে জলপথে শ্বশুরালয়ে নিয়ে যান। কিন্তু সকল যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও ৮/৯ দিন পর ১৯ জ্যৈষ্ঠ ব্রহ্মময়ীর মৃত্যু হয়। ভাটপাড়া থেকে প্রায় এক মাইল দূরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত শ্মশানক্ষেত্রে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এমনি করে "প্রিয়তমা পত্নীর দেহের সঙ্গে সাংসারিক সকল সুখ ও আশা-ভরসা শ্মশানে বিসর্জন করিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে" সংসার-বৈরাগ্যের পথে পা বাড়ান গিরিশচন্দ্র, এইভাবে তাঁর "জীবন-পুস্তকের পরীক্ষাপূর্ণ পবিচ্ছেদ সমাপ্ত হয়"।

ব্রহ্মময়ীর মৃত্যুর পর কিছুদিন গিরিশচন্দ্র উদ্‌ভ্রান্তের মতো বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। তারপর ঢাকায় এসে তাঁর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই শ্রাদ্ধসভায় তিনি প্রিয়তমা পত্নীর জীবনচরিত পাঠ করেন, পরে তা 'ব্রহ্মময়ীচরিত' (১৮৬৯) নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

গিরিশচন্দ্রের জীবনে ব্রহ্মময়ী একটি গভীর ছাপ ফেলে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রেরণা ও সান্ত্বনা গিরিশের জীবনের পরম পাথেয় হতে পেরেছিল। বলেছেন তিনি:

> দেশস্থ কোন আত্মীয় আমার সহায় ছিলেন না। মাতা ঠাকুরানী ও বড়দাদা অবৈধ উপায়ে আমাকে সমাজে গ্রহণ করিতে যত্নচেষ্টা করিতেছিলেন। তখন সহধর্ম্মিনী ব্রহ্মময়ী দেবী আমার প্রতি অতিশয় অনুকূল হইয়াছিলেন, তিনি আমার ধর্ম্মপথে সহায় ও বন্ধু ছিলেন, তাঁহার উৎসাহ, দৃঢ়তা ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় আমি ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছি, এবং স্থিরতর থাকিতে পারিয়াছি। তিনি কোন বিপৎ পরীক্ষায় ভীত ও বিচলিত হইতেন না, বরং আমি চিন্তিত হইলে সাহস ও উৎসাহ দান করিতেন। সেই ঘোরতর পরীক্ষার সময় আমি তাহার একখানা উৎসাহজনক পত্র পাইয়া অতিশয় সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি।[১৬]

নিজের আসন্ন মৃত্যুর কথা অনুমান করে ব্রহ্মময়ী স্বামীকে বলেছিলেন:

> শোক দুঃখ বিপদে তুমি অন্য লোককে সান্ত্বনা দান করিয়া থাক, কিন্তু উপস্থিত ব্যাপারে তুমি নিজে স্থির থাকিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে, তোমাকে সান্ত্বনা দান করার জন্য অন্য কাহারও যেন প্রয়োজন না হয়।[১৭]

গিরিশচন্দ্রের পত্নীপ্রেম ছিলো অসাধারণ। মুমূর্ষু স্ত্রীর জন্যে তাঁর যে উৎকণ্ঠা তা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। পত্নীর প্রতি অনুরাগ ও অনুভূতি যে কতো তীব্র ছিলো তা 'ব্রহ্মময়ী-চরিতে'র প্রতিটি ছত্রে ফুটে উঠেছে। ব্রহ্মময়ীর মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র সংসার সম্পর্কে নির্মোহ ও নিস্পৃহ হয়ে পড়েন, একটা বৈরাগ্য-ভাব তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বলেছেনও তিনি:

> ধর্ম্মজীবনের সহচরী সহধর্ম্মিনীর তিরোধানের পর হইতে বিষয়বন্ধনে বদ্ধ থাকিতে আমার অনিচ্ছা হইয়াছিল।[১৮]

প্রিয়তমা পত্নী ব্রহ্মময়ীর মৃত্যুর পর তিনি আর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নি।

কর্মজীবন

গিরিশচন্দ্রের পেশাগত কর্মজীবনের পরিসর খুবই সংক্ষিপ্ত। ময়মনসিংহের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল করিম সাহেবের কাছারীতে নকলনবিশের কাজে তিনি কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন। এখানেই তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। অবশ্য এই কাজটি প্রায় অবৈতনিক ছিলো বলা যায়। তিনি লিখেছেন:

> . . . তাহারা [অন্যান্য নকলনবিশেরা] প্রতি মাসে ৫০/৬০ টাকা উপার্জ্জন করিতেন, আমি তাঁহাদের অধীনস্থ হইয়া কাজ করিতে থাকি, তাঁহারা চাপকান পরিয়া মাথায় পাগরি বাধিয়া কাছারীতে যাইতেন; আমি ধুতিচাদর পরিয়া কাণে কলম গুজিয়া সাদাসিধেরূপে সেরেস্তায় যাইয়া বসিতাম। . . . বোধহয় ছয়মাসকাল আমি এইরূপ আফিসে গমনাগমন করিয়াছিলাম, এই ছয়মাসে আমার একটাকা মাত্র উপার্জ্জন হইয়াছিল, তাহাও নিজযোগ্যতায় নয়, উপরিস্থ যোগ্য নকলনবিশগণ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। কাছারীর সঙ্গে আমার জীবনের সম্পর্ক এ পর্য্যন্ত হয়।[১৯]

জীবিকার কোনো উৎস না থাকায়, বেকারজীবনের গ্লানি ও হতাশা এই সময় তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। তীব্র মনোদ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে তিনি কখনো কখনো আত্মহননের কথাও ভেবেছেন:

> এইসময় আমার অন্তরে ঘন বিষাদের ছায়া পড়ে, আমি মনে একবিন্দু শান্তি পাইতেছিলাম না, যেন অনলে দগ্ধ হইতেছিলাম। আমার বিদ্যা-বুদ্ধি যোগ্যতা কিছুই নাই, আমি মনুষ্য নামের অনুপযুক্ত, এই ভাব সর্ব্বদা মনে হইত, আর আপনাকে ধিক্কার দিতাম। আমি দুইতিনবার মানসিক যন্ত্রণায় আত্মঘাতী হইবার উদ্যোগী হইয়াছিলাম।[২০]

নর্মাল পাঠ্য সমাপ্ত করে গিরিশচন্দ্র ময়মনসিংহ হার্ডিঞ্জ স্কুলের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। পরে তাঁর পদোন্নতি হয়। এখানেই তার প্রকৃত কর্মজীবনে প্রথম প্রবেশ। এরপর ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে পণ্ডিতের চাকুরী লাভ করেন। শারীরিক অপটুতা, স্ত্রীবিয়োগজনিত মানসিক অবসাদ ও ব্রাহ্ম-বন্ধু গোপীকৃষ্ণ সেনের বিরূপতার কারণে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের পণ্ডিতের এই চাকুরী ত্যাগ করে তিনি ১৮৭৫ সালে কল-কাতায় কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রমে গিয়ে বাস করতে থাকেন। এই সময় কেশবচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের 'প্রকৃতি ও রুচি' বিচার করে তাঁকে স্বপ্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করেন। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন:

> আমি ছাত্রীদিগকে বাঙ্গলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়াইতাম, আমার নামে কিছু বেতন নির্দ্ধারিত ছিল, উহা আমি গ্রহণ করিতাম না, প্রচারভাণ্ডারে অর্পিত হইত। কয়েক বৎসর এ কার্যে আমাকে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। পরে দেশদেশান্তরে প্রচারের সঙ্গে আর শিক্ষকতা চলে না বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হয়।[২১]

এই সময়ে ঢাকায় গিয়ে তিনি 'বঙ্গবন্ধু' নামের সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনাকাজে যোগ দেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই এই পত্রিকার সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন করেন। গিরিশচন্দ্রের পেশাগত কর্মজীবনের এখানেই সমাপ্তি। এরপর ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক তাঁর কর্মজীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়। সে আরেক অধ্যায়।

পেশাগত কর্ম থেকে বিদায় নিয়ে তিনি বিশেষ অর্থকষ্টে পড়েন। তাই তাঁর জীবনযাপনের প্রয়োজনে পৈতৃক জমিজমার উপস্বত্বের উপর নির্ভর করতে হয়। অবশ্য অতি সামান্য অর্থই তিনি পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভ করতেন এবং তার কিছু অংশ আবার তিনি প্রচার-ভাণ্ডারেও জমা দিতেন। এইভাবেই চরম কৃচ্ছ্র সাধনার ভেতর দিয়ে সন্ন্যাসীর মতোই তিনি অনাড়ম্বর জীবন অতিবাহিত করেন।

সাংবাদিকতা ও সাময়িকপত্র সম্পাদনা

গিরিশচন্দ্র সেনের উদ্যোগী কর্মজীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় জুড়ে আছে তাঁর সাংবাদিকতা ও সাময়িকপত্র সম্পাদনার প্রসঙ্গে। সাপ্তাহিক 'ঢাকা-প্রকাশ' পত্রিকার ময়মনসিংহের সংবাদদাতা হিসেবে গিরিশচন্দ্রের সাংবাদিকতার হাতেখড়ি। সাংবাদিক হিসেবে তিনি যথেষ্ট সাহস ও নির্ভীকতার পরিচয় দেন। তার প্রেরিত সংবাদ-প্রতিবেদনের প্রতি প্রায় ক্ষেত্রেই সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতো। তবে কখনো কখনো বয়সের চাপল্যও তাতে প্রকাশিত হয়েছে। 'ঢাকা-প্রকাশে'র সংবাদদাতা হিসেবে তার ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন:

> বিচারকদিগের চরিত্র ও বিচারকার্য্যাদির বিরুদ্ধে আমি যাহা সমালোচনা করিতাম গবর্ণমেণ্ট প্রায়ই তাহার অনুসন্ধান লইতেন। একবার আমি ময়মনসিংহের সবডিনেট জজ বৃদ্ধ মৌলবি মোহাম্মদ নাজেমের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করি। গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার কৈফিয়ৎ তলব হয়, তাহাতে মৌলবি সাহেব অস্থির হইয়া পড়িলেন,, আমি সংবাদদাতা ইহা বুঝিতে পারিয়া আমাকে অপমানিত করিবার জন্য আপনার নাজির-যোগে ডাকিয়া পাঠান, আমি তাহার আদেশ মান্য করিয়া তাহার নিকট যাইতে সম্মত হই নাই। ময়মনসিংহের সবডিভিশন জামালপুরের সবডিভিশনল অফিসার একজন ফিরিঙ্গী ছিলেন, আমি ঢাকা প্রকাশে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে তীব্র তীব্র সমালোচনা করি। গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার অনুসন্ধান হয়। সেবার আমার নামে মানহানির মোকদ্দমা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বাস্তবিক সবডিভিশনল অফিসার নির্দ্দোষী ছিলেন, তাহার ভাগিনেয়ের দোষ ছিল। আমি শুনিতে ভুল করিয়া ভাগিনেয়ের

দোষ আমার উপর চাপাইয়াছিলাম। কোন কোন বন্ধুর যত্নে লাইবেল কেস হইতে পারে নাই, আমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও হয় নাই।[২২]

গিরিশচন্দ্র বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা-সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গত সভা থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু' নামক পত্রিকার শেষ পর্যায়ে কিছুদিন সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন তিনি।[২৩] এই পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সংযুক্তি ও সম্পর্কচ্ছেদের কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

> ঢাকা নগরে অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধু পত্রিকা সম্পাদনের ভার আমার উপর অর্পিত হয়। তখন উক্ত পত্রিকা সাপ্তাহিক ছিল। রাজনীতি সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধাদি তাহাতে লিখিত হইত। সেইসময় বঙ্গবন্ধুর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইয়াছিল। স্বর্গগত কৈলাসচন্দ্র নন্দী সেই পত্রিকার অধ্যক্ষ ও সম্পাদক ছিলেন। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় ও অপর কোন কোন বন্ধু তাহার পুষ্টিপোষক ছিলেন। রায় মহাশয়ের যত্ন ও উদ্যোগে এবং তাহার পরামর্শতে কৈলাসচন্দ্র বঙ্গবন্ধু সম্পাদনের ভার আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। কয়েক দিবস পরে কৈলাসচন্দ্র আমাকে না বলিয়া আমার অজ্ঞাতসারে বঙ্গবন্ধুর জন্য Manuscript লিখিয়া কম্পোজের জন্য কম্পোজিটারদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। আমি যথাসময়ে Manuscript প্রস্তুত করিয়া তৎসহ ছাপাখানায় যাইয়া দেখি যে, কৈলাসচন্দ্রের লিখিত প্রবন্ধাদি কম্পোজ হইতেছে। ইহাতে আমি দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া যাই এবং অবিলম্বে কলিকাতায় যাত্রা করিবার জন্য উদ্যোগী হই।[২৪]

জানা যায়, তাঁর সম্পাদকতায় 'বঙ্গবন্ধু'র বিশেষ উন্নতি হয়।[২৫]

গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে মাসিক 'মহিলা' পত্রিকা (শ্রাবণ ১৩০২) সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়:

> স্বদেশের সতী আর্য্যনারীদিগের উচ্চজীবন ও সুনীতিকে আদর্শ করিয়া জাতীয়ভাবে নারীচরিত্র গঠন ও সংশোধন এবং সমুন্নত করিতে প্রথম হইতে মহিলা পরামর্শদান ও যত্ন করিয়া আসিয়াছেন,

চিরকাল সেইরূপ যত্ন করিবেন তাঁহার এই সঙ্কল্প। বঙ্গীয় নারীমণ্ডলীতে যে সকল কুসংস্কার ও অনীতি এবং দূষিত আচারব্যবহার বদ্ধমূল হইয়া আছে এবং বিজাতীয় অন্তঃসারশূন্য বিলাসাড়ম্বর প্রবেশ করিতেছে, চিরকাল মহিলা সেই সকলের প্রতিবাদ করিবেন, ধর্ম্ম সুনীতি ও সদাচারের এবং নারীপ্রকৃতির অনুযায়িনী সৎশিক্ষায় সমর্থন করিবেন, প্রতিক্রিয়া মহিলার এই সঙ্কল্প ও উদ্দেশ্য।[২৬]

গিরিশচন্দ্র তাঁর 'আত্মজীবনীতে' 'মহিলা'র উপরিউক্ত উদ্দেশ্য পালনের সম্পর্কে জানিয়েছেন:

অনেক মহিলার ধর্ম্মহীনতা, অস্বাভাবিক সভ্যতা ও বিবীয়ানার বিরুদ্ধে দুঃখের সহিত আমাকে কখন কখন সমালোচনা করিতে হয়, তাহাতে আমি জানি জ্ঞানাভিমানিনী নব্য মহিলারা, বিশেষতঃ কোন কোন উপাধিধারিণী মহিলা তাহা পড়িয়া ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হন; কিন্তু মহিলা তাঁহাদের পরম হিতৈষিণী, এক্ষণ না বুঝিলে আশা করি সময়ে বুঝিতে পরিবেন।[২৭]

'মহিলা' পত্রিকার সাফল্য সম্পর্কে সমকালীন সাক্ষ্য থেকে জানা যায়:

ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে [গিরিশচন্দ্র] মহিলাদিগের শিক্ষায় নিযুক্ত করেন। তিনি আজীবন ঐ ব্রতকে সম্মান করিয়াছিলেন। নিজের দায়িত্বে "মহিলা" পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া "বামাবোধিনী পত্রিকা" ও "পরিচারিকা" পত্রিকার অভাব মোচন করিয়াছিলেন; "মহিলা"র সংবাদ এবং "ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ের" বক্তৃতা এবং নানা প্রবন্ধ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল। আমার স্মরণে আছে আমাদের শৈশবে অনুমান ৫/৬ বৎসর বয়সে তিনি একবার আমাদের ভাগলপুরের "বুলাবাংলা" বাড়ীতে আসিয়া কিছুদিন ছিলেন। তিনি উন্মুক্ত বারান্দায় একটি ক্যাম্পখাটে শুইয়া খাঁকের ও পালকের কলমে "মহিলা" পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ, মোসলমান শাস্ত্র প্রভৃতি অনুবাদ করিতেন...।[২৮]

গিরিশচন্দ্রের প্রেরণায়ও কোনো কোনো পত্রিকা প্রকাশিত ও পরিচালিত হয়েছে। তিনি নানাভাবে এইসব পত্র-পত্রিকাকে সাহায্য করতেন। তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায়:

আমি স্ত্রীলোকের জ্ঞানোন্নতিবিধায়িনী বামাবোধিনী পত্রিকার বহুকাল নিয়মিত প্রবন্ধলেখক ছিলাম। পরে আমারই প্রস্তাবে ও উদ্যোগে

কোরাণ শরিফ।

মূল কোরাণ শরিফ হইতে অনুবাদিত।

ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ তফসির অবলম্বনে টীকা লিখিত।

"পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও ভৃত্য।"

"পৃথিবীতে যে সকল বৃক্ষ আছে যদি তাহা লেখনী হয় ও সাগর মসী হয়, তৎপর (অন্য) সপ্ত সাগর হয়, তথাপি ঈশ্বরের বাণী সমাপ্ত হইবে না, নিশ্চয় ঈশ্বর বিজেতা ও জ্ঞানময়"।

(কোরাণ, সূরা লোকমান, ৩ রকু।)

কলিকাতা

৬৫।২ নং বিডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে,

শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৮ সন।

 মূল্য ৩ টাকা।

'কোরাণ শরিফ' গ্রন্থের আখ্যা-পত্র

মহাপুরুষচরিত।

[প্রথম ভাগ]

মহাপুরুষ এব্রাহিম, মুসা ও দাউদের জীবনচরিত।

[illegible]

নববিধান প্রচারক গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

[illegible]

[illegible]

[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible] সন।

 মূল্য ।৵৹ আনা।

'মহাপুরুষচরিত' গ্রন্থের আখ্যা-পত্র

THE FIRST FOUR KHALIFAS

OF THE ISLAM

[illegible]

The lives of AbuBekar Omar, Osman and Ali, the preaching companions of Mohammad the Founder of the Islam.

(Compiled from Original Sources)

[SECOND EDITION]

চারি জন ধর্ম্মনেতা।

অর্থাৎ

এসলামধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহম্মদের প্রধান প্রচারবন্ধু ও প্রথম খলিফা চতুষ্টয় আবুবেকর, ওমর ও ওসমান এবং আলির জীবনবৃত্তান্ত।

[দ্বিতীয় সংস্করণ।]

 মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

'চারিজন ধর্ম্মনেতা' গ্রন্থের আখ্যা-পত্র

নারীদের জন্য পরিচারিকা নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহার সম্পাদকীয় পদ গ্রহণ না করিলেও বহুকাল আমি একজন নিয়মিত লেখক ছিলাম।[২৯]

'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা[৩০] বা 'সুলভ সমাচার' পত্রিকার সহযোগী[৩১] হিসেবেও তার ভূমিকার কথা জানতে পারা যায়।

জন-হিতৈষণা ও নারীশিক্ষা প্রয়াস

গিরিশচন্দ্রের জনহিতৈষণা-কর্মের কিছু পরিচয় তাঁর 'উইলপত্রে'র মাধ্যমে পাওয়া যায়। তাঁর জন্মস্থানের প্রতি তাঁর মমত্ব ও কর্তব্যবোধ ছিলো প্রবল। তাঁর রচিত পুস্তকের লভ্যাংশের তিন-চতুর্থাংশ তিনি তার "দুঃখী জন্মভূমির অভাবমোচনে" ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একটি 'উইল' সম্পাদন করেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন:

> ঋণপরিশোধ ও পুস্তক পুনর্মুদ্রাঙ্কনার্থ ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া অর্থ সঞ্চিত থাকিলে দরবার প্রচারকার্যে ব্যয় করিবার জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা রাখিবেন, অবশিষ্ট ৭৫৲ টাকা আমার জন্মভূমি পাঁচদোনা গ্রামের দুঃখিনী বিধবা নিরাশ্রয় বালকবালিকা, দরিদ্র বৃদ্ধ নিরুপায় রোগী এবং নিঃসম্বল ছাত্র ও ছাত্রীদিগের অন্নবস্ত্র, চিকিৎসা ও বিদ্যাশিক্ষার সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে। জলকষ্ট দূর ও গৃহহীন দরিদ্রদিগের গৃহাভাব মোচন করার সাহায্য সেই অর্থ দ্বারা হইতে পারিবে।[৩৭]

শুধু যে নিজের গ্রামের জন্যে তাঁর কর্তব্য ও কল্যাণ-চিন্তা সীমাবদ্ধ ছিলো তা নয়, "পাঁচদোনা গ্রামের সন্নিহিত অপর গ্রামসকলের দুঃখী দরিদ্রদিগের বিশেষ বিশেষ অভাবমোচন" ও তার উদ্দেশ্যের অন্তর্গত ছিলো। তিনি তাঁর উইলে দৃঢ়ভাবে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'আমার পরিশ্রমজাত অর্থ ধর্ম্মপ্রচার ও পরসেবাতে ব্যয়িত হইবে।'

নারীকল্যাণ-চিন্তা গিরিশচন্দ্রের সমাজভাবনার একটি প্রধান দিক। নারীশিক্ষা ও নারীর ভাগ্যোন্নয়নের চেষ্টার স্বাক্ষর তাঁর কর্মকাণ্ডে পাওয়া। নারীসমাজের জাগরণ ও উন্নতির উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল ধরে 'মহিলা' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'বামাবোধিনী', 'পরিচারিকা'র মতো নারীসমাজ-সম্পর্কিত পত্রিকার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকেছেন। ব্রাহ্মসমাজের নারী-মুক্তি আন্দোলনের যে চিন্তা ও প্রয়াস তা গিরিশচন্দ্র সেনের কর্মকাণ্ডের ভিতর দিয়ে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি কীভাবে অনুভব করেন তার পটভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন :

> বাল্যকাল হইতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আমার বিশেষ উৎসাহ ও অনুরাগ। স্বদেশে গৃহে অবস্থানকালে প্রত্যেক পরিবারের বধূদিগের দুঃখদুরবস্থা ও তাঁহাদের প্রতি শাশুড়ীননদ প্রভৃতির অত্যাচার দর্শন করিয়া আমার মন অতিশয় ব্যথিত হইয়াছে। এইরূপ নিপীড়ন ও নির্য্যাতনের ভিতরে থাকিয়া তাঁহাদের মনোবৃত্তিসকল স্ফূর্তি পাইতেছিলনা, জ্ঞান-পিপাসা কিছুই চরিতার্থ হইতেছিলনা। ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাগণও বধূরূপে দাসীর ন্যায় দিবারাত্রি খাটিয়া গলদঘর্ম্ম হন, প্রায় কাহারও হইতে আদরযত্ন লাভ করেননা, কাজে একটু ত্রুটি হইলে গঞ্জনা ভোগ করেন, তাঁহাদিগকে নীরবে সকল কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাঁহাদের মুখ ফুটিয়া কথা কহিবার স্বাধীনতাটুকু নাই! এ সকল দেখিয়া মনে ক্লেশ পাইতাম, ভাবিতাম লেখাপড়া না শিখিলে, আত্মোন্নতি না হইলে, ইঁহাদের অবস্থার উন্নতি, স্বাধীন চিন্তা, মানসিক স্ফূর্তি হওয়া অসম্ভব। লেখাপড়া শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া আমি জন্মভূমি পাঁচদোনা গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সমুদ্যোগী হই।[৩৩]

অবশ্য কুসংস্কার ও অশিক্ষা-শাসিত অজ পল্লীগ্রাম পাঁচদোনায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গ সহজে অনুমোদন করেননি, বাধা-বিঘ্নও কম আসেনি। স্থানীয় ভদ্রপরিবারের কিছু বালিকা নিয়ে এই স্কুলটির সূচনা। স্কুলের সুপরিচালনার কারণে কিছুকালের মধ্যে সরকারী অনুদানও মঞ্জুর হয়। এই স্কুল-প্রতিষ্ঠার ফলাফল ছিলো দূরপ্রসারী ও শুভ। এই স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর অনেক বালিকাই বিবাহ-পরবর্তীকালে স্বামী বা অভিভাবকের চেষ্টায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে। অনেক ছাত্রী কৃতিত্বের সঙ্গে প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তিও লাভ করেছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্যে গিরিশচন্দ্র কলকাতা থেকে প্রায়ই গল্প ও ছড়া-ছবির বই কিংবা খেলার সামগ্রী পাঠাতেন। এই প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘজীবী হয়েছিল। ১৩১৩ সালে গিরিশচন্দ্র তাঁর 'আত্মজীবনে' উল্লেখ করেছেন, "চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল হইতে পাঁচদোনার বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতেছে।"

গিরিশচন্দ্রের ময়মনসিংহে শিক্ষকতাকালে সেখানে কোনো বালিকা বিদ্যালয় ছিলোনা কিংবা পারিবারিক পর্যায়েও বালিকাদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিলোনা। এখানেও গিরিশচন্দ্রের আন্তরিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি বালিকা বিদ্যালয়। তিনি বলেছেন :

> আমি মুড়াপাড়ার ভূম্যধিকারী এবং তত্রত্য কলেক্টরীর খাজাঞ্চি আমার পরমাত্মীয় বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে তাঁহার ময়মনসিংহস্থ আবাসে প্রথমে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করি। তাঁহার দুইটি কন্যা এবং অন্য ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেকগুলি কন্যা সেই বিদ্যালয়ে পড়িতে আরম্ভ করে। আমি কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ না করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ন্যূনাধিক তিনঘণ্টাকাল বোধহয় দুই বৎসর পর্যন্ত ছাত্রীদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছিলাম। কলেক্টর রেণাল্ড সাহেবের পত্নী দুইবার উক্ত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসেন, এবং একবার পারিতোষিকস্বরূপ নানাপ্রকার সিলাই করার ও খেলার সামগ্রী প্রদান করিয়াছিলেন। পরে আর আমার সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের অবকাশ হইয়া উঠে নাই, আমার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত স্কুলের কার্য বন্ধ হয়।[৩৪]

দীর্ঘকাল ব্যবধানে গিরিশচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের স্থানেই স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের উদ্যোগে মাধ্যমিক পর্যায়ের সরকার-অনুমোদিত 'বৃহদাকার' বালিকা বিদ্যালয় গড়ে- ওঠে।

ময়মনসিংহ থেকে কলকাতায় গিয়ে গিরিশচন্দ্র কেশবচন্দ্রের নির্দেশে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। বিদ্যাশিক্ষা ও সাহিত্য-চর্চার বিষয়ে তিনি অনেক অন্তঃপুরবাসিনীকেই সাহায্য ও প্রেরণা দিয়েছেন। ময়মনসিংহে থাকাকালীন সময়েই তিনি "স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনও প্রশ্নোত্তরচ্ছলে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক বনিতাবিনোদ নামক পুস্তক পদ্যে রচনা" করে প্রচার করেন। গিরিশের প্রেরণা ও যত্নে তাঁর পরিবারের মহিলা সদস্যরা বিদ্যাচর্চা, ছবি আঁকা, রচনা লেখা, হাতের কাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম ও স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে নারীশিক্ষা ও নারীর প্রতিভা বিকাশের বিষয়টিকে তিনি তাঁর,

অন্যতম ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এ-কথা তিনি স্পষ্টতই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, নারীসমাজকে শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত রাখলে, তার স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি না করলে ধর্মীয়, সামাজিক ও জাতীয় অগ্রগতি অসম্ভব।

চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য

গিরিশচন্দ্র সেন ছিলেন অনাড়ম্বর ও সহজ-সরল জীবনযাপনে বিশ্বাসী। তাঁর এই স্বেচ্ছা-দারিদ্র্যবরণের সঙ্গে তাঁর আদর্শবোধের একটি সূক্ষ্ম ঐক্য ছিলো। চিরকাল তিনি কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন, আক্ষরিক অর্থেই তিনি ছিলেন কঠোর মিতব্যয়ী, সরলতার মূর্ত প্রতীক। বলেছেন তিনি, "আমি কৃতবিদ্য পণ্ডিত হই নাই, গরিবানারূপে যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইয়াছি, চিরকাল গরিবানাচালে চলিয়া আসিয়াছি।"[৩৫] ছাত্রজীবন থেকেই তিনি বিলাসিতা ও আড়ম্বর পরিহার করেছেন। নিজের জীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন:

> আমি কখনও নিজের সুখ-বিলাসের জন্য অর্থশোষণ করিয়া অভিভাবকদিগকে ক্লেশ দান করি নাই, সামান্য অর্থব্যয় সামান্যরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া সামান্য চাকুরী করিয়াছি, অমিতাচারী কখনও হই নাই, নিজের সামান্য আয় হইতে কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া প্রতি বৎসর বড়দাদার হস্তে সমর্পণ করিতাম।[৩৬]

ছাত্রজীবনে তাঁর জলখাবারের তালিকায় ছিলো অতি সামান্য চিড়ে-মুড়ি-লাড়ু। পরবর্তী জীবনেও বিকেলে জলখাবারের জন্যে বরাদ্দ থাকতো আধ পয়সার মুড়ি। নিজের হাতে সব কাজ করতেন। কখনো বাধ্য না হলে পরমুখাপেক্ষী হতেননা। অধিকাংশক্ষেত্রে নিজেকেই রান্না করতে হতো। আহার-বিহারেও তাঁর কোনো আড়ম্বর ছিলোনা। আটচল্লিশ বছর বয়সের পর নিরামিষভোজী হন। ডাল-চচ্চড়ি-ভাতই তখন তাঁর খাদ্য ছিলো। বেশ-ভূষাতেও তিনি ছিলেন অতি সাধারণ। গর্বের সঙ্গেই ঘোষণা করেছেন: "আমি কখনও ইংরেজী জুতা পদে স্পর্শ করি নাই, কোনোরূপ বিলাতী পোষাক পরি নাই।"

উত্তরকালে কলকাতার ভারতাশ্রমে বাসকালে কিংবা ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকের কাজ করার সময়ও অতি সাধারণ ও দীনহীনভাবে জীবনযাপন করতেন।

এই অনাড়ম্বর-সরল জীবনযাপন তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছিল:

সামান্যভাবে জীবনযাপন করা আমার চিরকালের অভ্যাস। আমি সামান্য অন্নবস্ত্রাদিতে সন্তুষ্ট। ব্রাস ও চিরুনী দ্বারা কেশ-বিন্যাস এবং আর্শিতে মুখাবলোকন, ইহা আমাদ্বারা জীবনে বড় ঘটে নাই।

ছিলেন অকপট, সরল ও সত্যপ্রিয়, কষ্টসহিষ্ণু। যা বিশ্বাস বা সত্য বলে জেনেছেন তা প্রকাশ করতে কখনো দ্বিধা করেননি। তাঁর অসাধারণ সত্যনিষ্ঠার কারণে তাঁকে 'সত্যবাদী গিরিশচন্দ্র' বলে অভিহিত করা হতো। বিষয়-সম্পত্তির প্রসঙ্গে নির্লিপ্ত ও নির্লোভ ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হলে সে-ক্ষেত্রে দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে কুণ্ঠিত হননি। ছিলেন আদর্শনিষ্ঠ। আদর্শের কারণে আত্মীয় বা বন্ধু-বিচ্ছেদও স্বীকার করে নিয়েছেন। ছিলেন অভিমানীও। যখন তাঁর মা তাঁকে নিজের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন তখন তিনি বিশেষ আহত হন, তাঁর মনে একটা অভিমান জাগে। পরে মা যখন গিরিশকে কিছু অর্থ সাহায্য করতে চান প্রথমে তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান, পরে মা দুঃখ পাবেন এই ভেবে ছোটদিদির অনুরোধে তা গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই অর্থ নিজে ব্যবহার না করে মায়ের মৃত্যুর পরে তাঁর শ্রাদ্ধেই ব্যয় করেন।

নৈতিক চরিত্রের বিশুদ্ধতায় অতিমাত্রায় সচেতন ও বিশ্বাসী ছিলেন গিরিশচন্দ্র। ব্রাহ্মসমাজের অনেক উপাচার্য, প্রচারক ও সদস্য মদ্যপান করলেও তিনি জীবনে কখনো সুরাস্পর্শ করেন নি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর অবশিষ্ট জীবন তিনি আর পুনরায় দার পরিগ্রহ না করে ব্রহ্মচর্য পালন করেন।

গিরিশচন্দ্রের আত্মসম্মানবোধ ছিলো প্রবল। এ-ক্ষেত্রে কখনো তিনি আপোষ করেননি। তিনি তাঁর সম্পাদকীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করেন। মতপ্রকাশে কখনো দ্বিধা-সংকোচ রাখেননি মনে। কুচবিহার-বিবাহকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজ যখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়, তখন গিরিশচন্দ্র তাঁর যুক্তি ও বিশ্বাসমতে কেশবচন্দ্র সেনকে দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁর স্বাধীন, সাহসী ও সুনিশ্চিত মতামতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ ঘটে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এ-ক্ষেত্রে তিনি ব্রাহ্মসমাজের

সিদ্ধান্তের বিপক্ষে বঙ্গবিভাগকে স্বাগত জানান এবং স্বদেশী আন্দোলনের সমালোচনা করেন। অত্যন্ত পষ্টভাবে তিনি ঘোষণা করেন:

> আমি গত বৎসর আন্দোলনমত্ত বিপিন পাল প্রভৃতির প্রচারিত "অরন্ধন নিয়ম" "রাখিবন্ধন" বিধিপালন করি নাই। তাহাতে কোনরূপ যোগদান ও সহানুভূতি প্রকাশ করি নাই। কেননা ঢাকা নগরে রাজ-ধানীর সূত্রপাত আমার দুঃখের কারণ হয় নাই, বরং আনন্দের কারণ হইয়াছে।[৩৯]

তাঁর চরিত্রের আরো কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে তাঁর জীবনীকার জানাচ্ছেন:

> তিনি প্রকৃতির ভক্ত ছিলেন। প্রচারের সময় যখনই নৌকায় যাইতে হইত তখন তিনি নৌকার ছাদের উপরে উঠিয়া নির্জনে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ-করিতেন—যখনই কোন নূতন স্থানে যাইতেন যে সকল curio সম্ভব হইত সংগ্রহ করিয়া আনিতেন।[৪০]

গিরিশচন্দ্র আমৃত্যু জ্ঞানান্বেষী ছিলেন। বিদ্যাচর্চার জন্যে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেছেন। নিজের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলেছেন। জ্ঞানচর্চায় তাঁর এই আগ্রহ, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁর জ্ঞানসাধনার পরিচয় দিতে গিয়ে একজন লিখেছেন:

> রাত্রে আহারান্তেই তিনি শয়ন করিতেন—তিন-চারি ঘণ্টা নিদ্রার পর উঠিয়া নিশাকালেই উপসনা করিয়া লেখাপড়া করিতে আরম্ভ করিতেন এবং পুনরায় প্রয়োজন হইলে নিদ্রা যাইতেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশের তারিখ দেখিলেই বুঝা যায় তাহা কি অশেষ পরিশ্রম কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসের ফল।[৪১]

ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর সময়কে ধর্মপ্রচার, গ্রন্থ-রচনা ও অধ্যায়নের কাজে ব্যয় করেন। তিনি নিজেই যে শুধু পড়াশুনা করতেন তা নয়, অন্যদের মধ্যেও পাঠ-প্রবণতা ও জ্ঞান-জিজ্ঞাসা সঞ্চারিত করে দিতেন। তিনি প্রায়ই বিভিন্ন ব্রাহ্ম-পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করতেন এবং

তাঁদের মধ্যে নানা সদ্‌গুণাবলীর অনুশীলন যাতে হয় সে চেষ্টা করতেন। জানা যায়:

> ...সকল পরিবারে নিত্য উপাসনা, বৈরাগ্য ও পবিত্রতা, পাঠ অধ্যয়ন ও সেবার অভ্যাস যাহাতে বিস্তৃত হয় তাহার চেষ্টা করিতেন।[৪২]

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'নব্যভারত' পত্রিকা বলেছিল:

> আমরা অনেক লোক দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ আড়ম্বরহীন, নিষ্ঠাপূর্ণ, জ্ঞান-কর্মের সামঞ্জস্যময় জীবন দেখিয়াছি, বলিয়া মনে হয়না।[৪৩]

শেষজীবন ও মৃত্যু

মৃত্যুর ১১ বছর পূর্বে গিরিশচন্দ্র Erysipelas রোগে আক্রান্ত হন। লাহিয়াসরাই শহরে অবস্থানকালে তাঁর এই রোগের উদ্ভব হয়। প্রথমে দ্বারভাঙ্গা মহারাজার হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ জীবনচন্দ্র দত্ত তাঁর চিকিৎসা করেন। পরে আরা শহরে এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন ডাঃ নৃত্যগোপাল মিত্রের চিকিৎসায় প্রায় দুইমাস পরে আরোগ্যলাভ করেন।

১৮৯০ সালে মাঘোৎসবের সময় কলকাতায় তিনি নিউমোনিয়া রোগে গুরুতর আক্রান্ত হন। তাঁর বর্ণনায় জানা যায়:

> সেই রোগে আমার জীবনসংশয় হইয়াছিল। আমি এমন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, নিজে পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে পারিতামনা; এক বিন্দু দুগ্ধ গলাধঃকরণ করিতে কষ্টবোধ করিতাম; মাসাধিকাল শয্যাগত ছিলাম।[১৪]

বগুড়ার তৎকালীন সিভিল সার্জন ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায় তাঁর চিকিৎসা করেন। আরোগ্যলাভের পর তিনি পালামৌতে বায়ু পরিবর্তনের জন্য গিয়ে একমাস অবস্থান করেন। এই নিউমোনিয়া রোগে তাঁর শরীর অত্যন্ত অপটু হয়ে পড়ে এবং এর প্রভাব মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিলো।

শেষজীবনে অতিরিক্ত লেখালেখির কারণে তাঁর ডানহাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, পরে তিনি বামহাতে লেখার অভ্যাস করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর লেখার জগৎ থেকে অবসর নেননি।

গিরিশচন্দ্রের অন্তিমকালের বর্ণনা দিতে গিয়ে সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন :

> ১৯০৮-১৯০৯ খৃঃ তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং হৃদ্‌রোগ দেখা দেয়। ধর্মবন্ধুগণ ও প্রচারাশ্রমের যুবকেরা তাঁহার সেবার জন্য ব্যস্ত হন। শ্রদ্ধেয় রায়বাহাদুর ডা: মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে নিজের পরিবারে কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে আনিয়া সেবা-শুশ্রূষা করেন। ভাই গিরিশচন্দ্রের ভাগিনেয় স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত আই সি এস কোন্নগরে গঙ্গার ধারে এবং পুরীতে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিছুতেই বিশেষ উপকার হইলনা। তখন ভাই গিরিশচন্দ্র বুঝিলেন যে এই রোগ আরামে সারিবার নয়, পরলোক হইতে আহ্বান আসিয়াছে। তাঁহার অন্তরে স্বদেশপ্রেম ছিল অতি প্রবল। তিনি স্বদেশে ঢাকায় শেষ দিনগুলি কাটাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[৪৫]

মৃত্যুর প্রায় মাসখানেক পূর্বে গিরিশচন্দ্রের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে ঢাকা শহরে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বাসের জন্যে আনা হয়। আশেপাশের গ্রাম থেকে আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশীরা তাঁকে রোজই এসে দেখে যেতেন। এই পরিবেশ গিরিশচন্দ্রের জন্যে তৃপ্তি ও সান্ত্বনা বহন করে এনেছিল। এখানে তিনি ১৯১০ সালের ১৫ আগস্ট (৩০ শ্রাবণ ১৩১৭) সোমবার সকাল ১০—৩০ মিনিটে ৭৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।[৪৬] হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেন।

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও শোকের ছায়া নেমে আসে। গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমনে শোকাভিভূত একজন মুসলমান ভক্ত নববিধান প্রচারাশ্রমে এক আবেগময় পত্র লিখে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেন :

> আজ বঙ্গীয়-মোছলমান দিগের একজন সুহৃদ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। হায়। কে আর এখন আরব্য ও পারস্য ভাষা হইতে উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করিয়া মোসলমানদিগকে ইসলামের বিষয় শিক্ষা দিবে?
>
> —'ধর্মতত্ত্ব': ১৬ ভাদ্র ১৮৩৯ শক।[৪৭]

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর মূল্যায়ন করে 'নব্যভারত' পত্রিকা যে মন্তব্য করেছিলেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

> নববিধান বাঁচিয়া থাকে যদি, তবে গিরিশচন্দ্র অমর; বাঙ্গালাভাষা বাঁচিয়া থাকে যদি, গিরিশচন্দ্র অমর; মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র বাঁচিয়া থাকে যদি, তবে গিরিশচন্দ্র অমর এবং নির্ভয়ে লিখিতেছি, পুণ্য, নিষ্ঠা, বিশ্বাস, ভক্তি, চরিত্র এবং স্বদেশপ্রেম বাঁচিয়া থাকে যদি, তবে গিরিশচন্দ্র অমর! অমর-জীবনের অমর কাহিনী পাঠক নিবিষ্ট-চিত্তে একবার অধ্যয়ন কর, জীবন সার্থক হইবে।[৪৮]

লেখক-জীবন, রচনা-বৈশিষ্ট্য ও গ্রন্থ-পরিচিতি

গিরিশচন্দ্র সেন সৃষ্টিধর্মী লেখক ছিলেন না, আর বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। মূলত ধর্মীয় প্রয়োজনেই তাঁর সমগ্র রচনার জন্ম। তাঁর ধর্মজীবন, কর্ম-প্রয়াস ও রচনাবলীর সঙ্গে পারস্পরিক গভীর আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

গিরিশচন্দ্র বাল্যকালে গ্রামের সখীসংবাদের গানের দলের সংস্পর্শে আসেন। তিনি সারারাত সোৎসাহে জেগে গান শুনতেন, আবার কখনো বা গানের খাতা দেখে গান বলে দিতেন। এরপর যখন ফারসী শিখতে গেলেন তখন 'মাদনোজ্জুওয়াহের', 'মহব্বতনামা', 'বহরদানেশ' প্রভৃতি অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ কাব্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে, যার ফলাফল শুভ হয়নি।

গিরিশচন্দ্র যখন ময়মনসিংহে সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্র তখন উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠ এবং সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তিনি কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, অভিজ্ঞান শকুন্তলা, বাল্মীকি রামায়ণ প্রভৃতির চর্চা করেন। তিনি বলেছেন:

> ...অল্পদিনের মধ্যে সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। প্রতিদিন তর্করত্ন মহাশয় বা ছোটদাদা পণ্ডিত হরচন্দ্র রায় এক একটি সমস্যা পূরণ করিতে দিতেন, আমি তাঁহাদের হইতে শ্লোকের অন্ত্যচরণ পাইয়া সেই ভাব অবলম্বনে পূর্ববর্তী তিন চরণ পূরণ করিয়া দিতাম। তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। উপক্রমণিকা ও ঋজুপাঠ পড়িয়া এরূপ সমস্যা পূরণ কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল। আমি সংস্কৃত কবিতায় ষড়ঋতু বর্ণনা করিয়াছিলাম। কবিতা লিখিতে আমার বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ হইয়াছিল।[৪৯]

এরপর ময়মনসিংহের হার্ডিঞ্জ বঙ্গবিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি বাংলা কবিতাচর্চায় আগ্রহী হন এবং অল্পদিনে যথেষ্ট সাফল্যও অর্জন করেন।

তাঁর আত্মজীবন-সূত্রে জানা যায়:

> এইসময়ে বাঙ্গলা কবিতা রচনায় আমার অতিশয় উৎসাহ ও অনুরাগ জন্মে: আমি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পদ্যরচনা করিয়া ঢাকা নগর হইতে প্রকাশিত চিত্তরঞ্জিকা নামক সাময়িক পত্রিকায় লিখিয়া পাঠাইয়াছি, আমি "বনিতাবিনোদ" নামক একখানা পদ্যপুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম, উক্ত পুস্তক কোন বিদ্যালয়ে পাঠ্যও হইয়াছিল। সেই পুস্তকে স্বামী-স্ত্রীর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছিল।[৫০]

কবিতার পাশাপাশি এইসময় গদ্যচর্চাতেও তাঁর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ময়মনসিংহের ছাত্রসভায় প্রায়ই তিনি রচনা পাঠ করতেন এবং অনেক ছাত্রের রচনার পরীক্ষকের দায়িত্বও পালন করতেন। 'ঢাকা-প্রকাশে'র সংবাদদাতা হিসেবে সংবাদ প্রতিবেদন ও নিবন্ধও রচনা করতে হতো তাঁকে।

ময়মনসিংহের হার্ডিঞ্জ স্কুলে শিক্ষকতাকালে সাদীর ফারসী 'গুলিস্তাঁ' পুস্তক অনুবাদ করেন এবং তা 'হিতোপাখ্যানমালা' (১ম ভাগ) নামে প্রকাশিত হয়। এই বইটি আসাম ও বাংলার স্কুলসমূহের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়। বইটি অসাধারণ জনপ্রিয়তাও লাভ করে, ১৩১৩ সাল নাগাদ এর তেরোটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়।

এরপর তিনি তাঁর কয়েকজন আত্মীয়-বিয়োগে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। স্ত্রীবিয়োগে 'ব্রহ্মময়ীচরিত', মায়ের মৃত্যুতে 'মাতৃবিয়োগে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস', দিদি বরদেশ্বরী দেবীর জীবনচরিত এই পর্যায়ের রচনা। 'সতীচরিত' নামে তিনি রাণী শরৎসুন্দরী দেবীর একটি জীবনীও রচনা করেন। 'আত্মজীবন' নামে তাঁর স্বরচিত জীবনচরিত গ্রন্থটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

এ-ছাড়া তিনি ধর্মতত্ত্ববিষয়ে অনেকগুলো বই ও প্রবন্ধ রচনা করেন। 'শ্রীমদ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী', 'কোচবিহার বিবাহের বৃত্তান্ত', 'বর্ম্মাদেশ ও বর্ম্মাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম', 'পাঞ্জাবে ধর্ম্মপ্রভাব', 'তত্ত্বসন্দর্ভ-মালা' প্রভৃতি পুস্তক ও প্রবন্ধের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কয়েকটি বই উর্দু ভাষাতেও প্রকাশিত হয়।

তবে ইসলামীশাস্ত্রের চর্চা ও মুসলিম ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের জীবনচরিত রচনা গিরিশচন্দ্র সেনের জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় কাজ। তাঁর খ্যাতি, পরিচিতি প্রতিষ্ঠা মূলত এই কর্মকাণ্ডের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী শাস্ত্রচর্চার জন্যে তিনি যথেষ্ট সময় ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি ইসলামীশাস্ত্রের গ্রন্থাবলী মূল আরবী ও ফারসী ভাষা বাংলায় অনুবাদ করেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রেরণা ও নির্দেশে গিরিশচন্দ্র ইসলামী শাস্ত্রচর্চায় নিয়োজিত হন। তিনি জানিয়েছেন:

> নববিধান ঘোষণার পর বিধানাচার্য্য একদিন শ্রীদরবারে এক একজন প্রচারককে এক একটি বিশেষ কার্য্য ও ভাব দ্বারা চিহ্নিত করেন। মোহাম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা এবং সেই শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ ও তাহা অনুবাদপূর্ব্বক প্রচার করা আমার কার্য্য, এবং সত্যানুরাগ আমার ভাব নির্দিষ্ট হয়।[৫১]

গিরিশচন্দ্র যখন এই দুরূহ কাজে হাত দিলেন তখন কেশবচন্দ্র নানা-ভাবে তাঁকে উৎসাহিত করেন। 'মহাপুরুষ মোহাম্মদ এবং তৎপ্রবর্ত্তিত ইসলামধর্ম্ম' পুস্তকের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র বলেছেন:

> যে ভারবহন যোগ্য সবল অশ্বপৃষ্ঠ, ঈশ্বর সেই ভার দুর্ব্বল গর্দ্দভপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়াছেন; এ বিষয়ে তাঁহাব যে কি লীলা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিনা। আমি অবিদ্বান ও নানাপ্রকারে অযোগ্য। তাঁহার বিশ্বাসী ভক্ত বিধানাচার্য্যের শুভদৃষ্টি এই অক্ষম অযোগ্য ব্যক্তির উপর পড়ে। এসলাম ধর্ম্মের শিক্ষাপ্রদ নিগূঢ় তত্ত্বসকল যাহা সাধারণের জ্ঞানের অগম্য হইয়া আছে, তাহা প্রকাশ করিতে পারিব, পূর্ব্বে আমি মনেও করিতে পারি নাই। প্রথমে আমি আরব্যভাষার চর্চা কিছুই করি নাই, সামান্যরূপে পারস্যভাষার আলোচনা করিয়া-ছিলাম; ভাষাজ্ঞান যাহাকে বলে তাহা আমার কিছুই জন্মে নাই। পরে মনের আবেগে পরিণত বয়সে লক্ষ্ণৌ নগরে যাইয়া কিয়ৎকাল অবস্থান-পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ আরব্যভাষার চর্চ্চা করা গিয়েছিল। এমন অবস্থায় বিধানাচার্য্য ব্রহ্মমন্দিরের পবিত্র বেদী হইতে আমি মোহাম্মদীয় ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহাতে আমি বিস্মিত হই;

বোধহয় আমার ন্যায় অপর সকলেও বিস্মিত হইয়াছিলেন। কমল সরোবরে জল-সংস্কারের দিন ব্রহ্মানন্দ স্বহস্তে আমার মস্তকে তৈলার্পণ করিয়া বলিলেন, "আমি মহাপুরুষ মোহাম্মদের অঙ্গে তৈল প্রক্ষণ করিতেছি।" যখন তাঁহার বিশেষ প্রেমোন্মত্ততার ভাব, তখন তিনি আমার নিকটে প্রেমোন্মত্ত খাজা হাফেজের গজল পড়িতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি কিছুদিন তাঁহাকে দেওয়ান হাফেজ পড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাঁহারই আগ্রহ ও অনুরোধে হাফেজের গজল কিয়দংশ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা গিয়াছিল। সেই অনুবাদদর্শনে তাঁহার বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল। কোরাণের বঙ্গানুবাদ খণ্ডশঃ আকারে প্রথমে দুইতিন খণ্ড প্রকাশিত হইলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন; কেহ অনুবাদের ভাষার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।[৫২]

কেশবচন্দ্রের প্রেরণার আরো পরিচয় পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্রের 'আত্ম-জীবনে' বলেছেন তিনি :

জাহাজে অবস্থিতিকালে কবিবর শেখ সাদী প্রণীত প্রসিদ্ধ বুস্তান নামক নীতিপূর্ণ পারস্য পদ্যগ্রন্থ বঙ্গভাষায় গদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলাম, পরে তাহা হিতোপাখ্যানমালা দ্বিতীয় ভাগ নামে প্রকাশ করা গিয়াছিল। আমি আচার্য্যদেবকে বুস্তানের প্রেমমত্ততা পরিচ্ছেদের কিয়দংশের অনুবাদ প্রচার ক্ষেত্র হইতে উপহার দিয়াছিলাম। তিনি তাহা পাইয়া আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন, "এই অমূল্য উপহার পাইয়া আমি চরিতার্থ হইয়াছি, আমাকে এইরূপ উপহারই দিবে।"[৫৩]

গিরিশচন্দ্রের ইসলামী শাস্ত্রচর্চার মধ্যে কোরআন শরীফের বঙ্গানুবাদ সব-চেয়ে মূল্যবান ও স্মরণীয় কাজ। তাঁর খ্যাতি ও পরিচিতির প্রধান উৎসও এই অনুবাদকর্মটি। কোরআন শরীফের অনুবাদের ফলেই তাঁকে 'মৌলবী গিরিশচন্দ্র', 'ব্রাহ্ম মোসলমান' প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হয়। এখানে স্মরণযোগ্য যে তিনি সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় কোরআন শরীফের অনুবাদ করেন।

"মোসলমান জাতির মূলধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণ পাঠ" করে "এসলামধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব অবগত" হওয়ার জন্য গিরিশচন্দ্র ১৮৭৬ সালে ৪২ বছর বয়সে

লক্ষ্ণৌ শহরে আরবী ভাষা শিখতে যান। পরে কলিকাতা ও ঢাকায় আরো কিছুদিন আরবী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন। এরপর কোরআন শরীফ পাঠের আগ্রহ জাগে তাঁর। কিন্তু মুসলমান কেতাব-বিক্রেতা অমুসলিম বিবেচনায় তাঁর কাছে কোরআন বিক্রয় করবেন না ভেবে তিনি তাঁর ঢাকার মুসলমান ব্রাহ্ম-বন্ধু জালালুদ্দিনের সহায়তায় একখণ্ড কোরআন শরীফ সংগ্রহ করেন এবং:

> আমি তফসির ও অনুবাদের সাহায্যে পড়িতে আরম্ভ করি। যখন আমি তফসিরাদির সাহায্যে আয়ত সকলের প্রকৃত অর্থ কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম, তখন তাহা অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ১৮৮১ সালের শেষভাগে আমি ময়মনসিংহে যাইয়া স্থিতি করি, সেখানে কোরাণ শরিফ কিয়দ্দূর অনুবাদ করিয়া প্রতিমাসে খণ্ডশঃ প্রকাশ করিবার জন্য সমুদ্যত হই। শেরপুরস্থ চারুযন্ত্রে প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয়, পরে কলিকাতায় আসিয়া খণ্ডশঃ আকারে প্রতিমাসে বিধানযন্ত্রে মুদ্রিত করা যায়। প্রায় দুই বৎসরে কোরাণ সম্পূর্ণ অনুবাদিত ও মুদ্রিত হয়। পরিশেষে সমুদায় এক খণ্ডে বাঁধিয়া লওয়া যায়। প্রথমবারে সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষিত হইলে পরে ১৮৯৮ সালে কলিকাতা দেবযন্ত্রে তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। দ্বিতীয়বারের সহস্র পুস্তকও নিঃশেষিত প্রায়। এক্ষণ [১৩১৩] সংশোধিত আকারে তাহার তৃতীয় সংস্করণের উদ্যোগ হইতেছে।[৩৪]

বাংলা ছাড়া উর্দুভাষাতেও তাঁর বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর কোনো কোনো উর্দু পুস্তক ও বক্তৃতা লাহোর ব্রাহ্মসমাজের সদস্য বলারাম ভীমবাট কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তাঁর উর্দু রচনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

> "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" ও "ধর্মশিক্ষা" এবং "সামাজিক উপাসনা প্রণালী ও প্রার্থনামালা" অপিচ "কতকগুলি ধর্ম্মকথা" ও "ধর্মোপদেশ" নামক পুস্তক উর্দু ভাষায় অনুবাদ করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা গিয়াছে। সামাজিক উপশনাপ্রণালী ও প্রার্থনামালা এবং কতকগুলি ধর্ম্মকথা ও ধর্মোপদেশ এই তিনখানা ক্ষুদ্র পুস্তক, ইহা আচার্য্য কর্তৃক প্রণীত। আমি লক্ষ্ণৌ নগরে পাঠ্যাবস্থায় এই পুস্তিকাত্রয় অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলাম। প্রথমোক্ত পুস্তকদ্বয় অর্থাৎ

ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান ও ধর্মশিক্ষা উর্দুভাষায় অনুবাদ করিয়া "ব্রাহ্মধর্মকা দস্তরোল আমল" এবং "তালিমোল ইমান" নামে প্রকাশ করা গিয়াছে, তাহা এবং তিনটি উর্দু বক্তৃতা "মজহরে হাক্কানী" "ইমান কা চীজ হ্যায়" ও "নয়ী সরিয়ত ক্যা হ্যায়" লাহোর ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সভ্য লালা বলারাম ভিমবাট´ আমা হইতে (Manuscript) পাইয়া লাহোরে মুদ্রিত করিয়াছেন। প্রথমোক্ত বক্তৃতার সমস্ত মুদ্রাঙ্কন-ব্যয় বন্ধুবর স্বর্গগত ডাক্তার দুর্গাদাস রায় ও পার্ব্বতীচরণ রায় অযাচিতভাবে প্রদান করিয়াছিলেন। অপর পুস্তক ও বক্তৃতা সকলের মুদ্রাঙ্কন-ব্যয় নিজ ইচ্ছায় উক্ত লালাজী যোগাইয়াছেন। বাঁকিপুরে "আস্রারে এবাদত" (উপসনাতত্ত্ব) বিষয়ে প্রথম উর্দ্দু বক্তৃতা হয়। ১৮৯৯ সনে তাহা পাটনা নগরে মুদ্রিত হইয়াছে। গত বৎসর [১৯০৬] জুন মাসে "হকতালা গায়েব নহী বলকে হাজের হ্যায়" (ঈশ্বর অনুপস্থিত নহেন বরং উপস্থিত) এ বিষয়ে উর্দ্দু বক্তৃতা হইয়াছিল। তাহা স্বর্গগত বিশ্বনাথ রায় কর্ত্তৃক স্থাপিত অযোধ্যা ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ভাণ্ডারের সাহায্যে সম্প্রতি লাহোরে মুদ্রিত হইয়াছে।[৫৫]

গিরিশচন্দ্রের অগ্রন্থিত রচনার সংখ্যাও কম নয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রচুর রচনা প্রকাশিত হয়। 'মহিলা', 'বামাবোধিনী', 'পরিচারিকা', 'ধর্মতত্ত্ব', 'ঢাকা প্রকাশ', 'বঙ্গবন্ধু' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচনা গ্রন্থভুক্ত হয় নি। অনেক রচনায় লেখকের নাম মুদ্রিত হতোনা বলে গিরিশচন্দ্রের সেইসব রচনাকে চিহ্নিত করার উপায় আজ আর নেই। তাঁর কিছু কিছু রচনার পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে বা বিনষ্ট হয়ে গেছে।

গিরিশচন্দ্র তাঁর সাধনার ক্ষেত্রে সমকালে নিতান্ত নিঃসঙ্গ ছিলেন, কোনো সহযাত্রী পাননি। তাঁর দেহাবসনের পরও মেলেনি কোনো উত্তরসূরী, যিনি তাঁর কাজকে সম্পূর্ণতা দান করতে পারেন বা তাঁর কাজের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এমন কী তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের মূল্যবান বই-পুস্তক ও তাঁর রচনা বা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থাও কেউ করেননি। গিরিশ-জীবনীকার সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় কিছুটা বেদনা ও ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন :

> দুঃখের বিষয় ভাই গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমনের পর তাঁহার কার্যের সূত্র ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজের, কিংবা মোসলমানসমাজে কেহই

মোসলমানধর্মের চর্চা এবং অন্যান্য ধর্মের সহিত তাহার সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করেন নাই। ভাই বলদেব নারায়ণ ও অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত কিঞ্চিৎমাত্র চেষ্টা করিয়াছিলেন দেখা যায়। ভাই গিরিশচন্দ্র যে সকল অমূল্য আরবী, পার্শী ও উর্দ্দু গ্রন্থ ও পুঁথি সংগ্রহ করিয়া যান তাহাও কেহ নাড়িয়া দেখেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে যখন স্তূপীকৃত ঐ সকল গ্রন্থ ও পুঁথি আমরা হস্তে অর্পিত হয় তখন তাহা মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। আমি তাহা সঙ্গে সংঙ্গে এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিই। কিন্তু তখন তাহা হইতে কিছু উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই। ভাই গিরিশচন্দ্র "হাফেজের" অপরার্ধ অনুবাদ করিয়াছিলেন; অযত্নে পাণ্ডুলিপি হারাইয়া যায়। "হদিস" গ্রন্থের যে অংশ তিনি অসমাপ্ত রাখিয়া যান তাহা আজও কেহ সম্পূর্ণ চেষ্টা করিবার নাই।[৫৬]

গ্রন্থ-পরিচিতি

ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের প্রায় সব গ্রন্থই আজ অতি দুষ্প্রাপ্য। কেবল তাঁর অনূদিত 'কোরআন শরীফ' সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়ে পাঠকসমাজের কাছে সহজলভ্য হতে পেরেছে। এখানে গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর যথাসম্ভব বিস্তৃত ও কালানুক্রমিক পরিচয় প্রদান করা হলো।[৫৭]

১. **বনিতাবিনোদ**। 'পদ্যপুস্তক'। বিদ্যালয়-পাঠ্য হয়েছিল। "সেই পুস্তকে স্বামী-স্ত্রীর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছিল।" ('আত্মজীবন', পৃঃ ১৬)।

২. **ব্রহ্মময়ী-চরিত**। প্রকাশকাল: কলিকাতা, ১২৭৬ (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ)। পৃষ্ঠা: ৩+৫৭।

স্ত্রী ব্রহ্মময়ীর মৃত্যুতে গিরিশচন্দ্র এই গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি বলেছেন: "শ্রাদ্ধসভায় পত্নীর জীবনকাহিনী বিবৃত হইয়াছিল। বন্ধুগণের আগ্রহ ও অনুরোধক্রমে অল্পদিন পরে তাহা জমীদার হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের অর্থসাহায্যে পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত করা হয়। এই পুস্তকের এ পর্যন্ত তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে।" ('আত্মজীবন', পৃঃ ৩৯)।

৩. **হিতোপাখ্যান মালা (১ম খণ্ড)**। প্রকাশক ও মুদ্রক: হরিমোহন বসাক, গিরিশ প্রেস, ঢাকা। প্রকাশকাল: ১৩ নভেম্বর ১৮৭১। মূল্য: পাঁচ আনা, পৃষ্ঠা: ৯৬। শেখ সাদীর 'গুলিস্তাঁ' পদ্যগ্রন্থের গদ্যানুবাদ। জানা যায়: "উহা আসাম প্রদেশের বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত হয়, পরে বঙ্গদেশের অনেক জিলার স্কুলসমূহের পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তক ক্রমে ত্রয়োদশবার মুদ্রিত করা হইয়াছে।" ('আত্মজীবন', পৃঃ ১৭)।

৪. **হিতোপাখ্যান মালা (২য় খণ্ড)**। শেখ সাদীর 'বুস্তাঁ' পদ্যগ্রন্থের গদ্যানুবাদ। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত। পরবর্তীসময়ের ১ম

ও ২য় খণ্ডের নির্বাচিত অংশ নিয়ে বইটির একটি ভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৫. **ধর্ম্ম ও নীতি**। প্রকাশক: উমেশচন্দ্র দত্ত। মুদ্রক: গোপালকৃষ্ণ মিত্র, ওল্ড ইণ্ডিয়ান প্রেস, ২৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৮ জুলাই ১৮৭৩। মূল্য: দুই আনা। পৃষ্ঠা: ১৯।

৬. **ধর্ম্ম-বন্ধু**। প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী: ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা। মুদ্রক: মণিমোহন রক্ষিত, ইণ্ডিয়ান মিরার প্রেস, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ২০ আগস্ট ১৮৭৬। মূল্য: দুই আনা। পৃষ্ঠা: ৩৬। 'আকগিরে হেদায়েত' হতে অনূদিত।

৭. **হাফেজ (১ম খণ্ড)**। প্রকাশক: ব্রাহ্মসমাজ মিশন, ১৩ মীর্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা। মুদ্রক: মণিমোহন রক্ষিত, ইণ্ডিয়ান মিরার প্রেস, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ২৩ জানুয়ারী ১৮৭৭। মূল্য: চার আনা। পৃষ্ঠা: ৪৭। 'সুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি হাফেজের নৈতিক উপদেশ ও বাণী'র বঙ্গানুবাদ।

খ. **হাফেজ (২য় খণ্ড)**। প্রকাশক ও মুদ্রক: গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, ৬৫/২ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১ ফেব্রুয়ারী ১৮৯০। মূল্য: চার আনা। পৃষ্ঠা: ৮৮।

গ. **হাফেজ (৩য় খণ্ড)**। প্রকাশক ও মুদ্রক: বিশ্বনাথ দাস, ২০ পাটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। ১৮ অক্টোবর ১৮৯১। মূল্য: চার আনা। পৃষ্ঠা: ৯৬।

ঘ. **হাফেজ (৪র্থ খণ্ড)**। প্রকাশক ও মুদ্রক: জগবন্ধু ঘোষ, ২০ পাটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ২০ অক্টোবর ১৮৯২। মূল্য: চার আনা। পৃষ্ঠা: ৯৬।

৮. **দরবেশদিগের উক্তি**। প্রকাশক ও মুদ্রক: মণিমোহন রক্ষিত, ইণ্ডিয়ান মিরার প্রেস, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৯ আগস্ট ১৮৭৭। মূল্য: দুই আনা। পৃষ্ঠা: ৩২। ফারসী পুস্তক 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' থেকে মুসলমান দরবেশদের উক্তি সংগৃহীত।

৯. **নীতিমালা (১ম খণ্ড)**। প্রকাশক ও মুদ্রক: মণিমোহন রক্ষিত, ইণ্ডিয়ান মিরার প্রেস, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৯ আগস্ট

১৮৭৭। মূল্য : চার আনা। পৃষ্ঠা : ৮০। 'আকসিরে হেদায়েত' নামক উর্দু গ্রন্থ হতে অনূদিত।

১০. দরবেশদিগের ক্রিয়া। প্রকাশকাল : কলিকাতা, ১৮৭৮। পৃষ্ঠা : ৬৪।

১১. দরবেশদিগের সাধনপ্রণালী (১ম খণ্ড)। প্রকাশক ও মুদ্রক : মণিমোহন রক্ষিত, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রকাশকাল : ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯। মূল্য তিন আনা। পৃষ্ঠা : ৩৫।

১২. প্রবচনাবলী। প্রকাশক ও মুদ্রক : পূর্ণচন্দ্র দে, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রকাশকাল : ২৪ জানুয়ারী ১৮৮০। মূল্য : এক আনা। পৃষ্ঠা : ১৬।

১৩. তাপসমালা (১ম ভাগ)। প্রকাশক ও মুদ্রক : পূর্ণচন্দ্র দে, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রকাশকাল : ৯ অক্টোবর ১৮৮০। মূল্য : আট আনা। পৃষ্ঠা : ৮০। গ্রন্থস্বত্ব : গ্রন্থকার। দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৮৮৬।

'তাপসমালা' ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এতে ৯৬ জন মুসলমান সাধক-পুরুষের জীবন ও বাণী সংকলিত হয়েছে। 'তাপসমালা' মওলানা ফরিদউদ্দীন আত্তার রচিত সুবিখ্যাত ফারসী গ্রন্থ 'তাজকেরাতুল আও-লিয়া'র বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক বলেছেন :

"আমি তেজকরতোল আওলিয়া অবলম্বন করিয়াই তাপসমালা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা অনুবাদ মাত্র, কিন্তু সমুদায় অবিকল অনুবাদ নহে। অনেক স্থানে ভাষাপ্রণালীর অনুরোধে ও অন্য অন্য কারণে ভাবমাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং কোন কোন অংশ অনাবশ্যকবোধে একেবারে পরিত্যাগ করা গিয়াছে।

. . . . . .সেইসকল পরম ভক্ত বৈরাগী পুরুষ মোসলমান রত্ন এবং সমুদায় লোকের ভক্তিভাজন। ইঁহাদের পবিত্র জীবনের আলোচনায় মহাপুণ্য। আমি তৎপাঠে বিশেষরূপে উপকৃত ও তাঁহাদের জীবনের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছি। তাঁহারা যে সকল সত্যরত্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য পৃথিবী চিরকাল তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে। উক্ত মহর্ষিদিগের জীবনালেখ্য বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইলে তাঁহাদের স্বর্গীয় চরিত্রের আলোক এদেশীয় লোকের চরিত্রে সংক্রামিত হইয়া

ঈশ্বরভক্তি ও সাধুভক্তির কুসুম প্রস্ফুটিত করিবে, এবং মোসলমান জাতি-সম্বন্ধে বদ্ধমূল কুসংস্কার লোকের অন্তর হইতে দূর করিবে এই উদ্দেশ্যে আমি তাহা ভাষান্তরিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি একজন নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্ম। নববিধান সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তদিগকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে ও তাঁহাদের নিকটে অবনত মস্তকে সত্য শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন। আমি সেই উদার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মোসলমান মহর্ষিদিগের শরণাপন্ন হইয়াছি এবং সমাদরে তাঁহাদিগকে বন্ধুগণের নিকটে উপস্থিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।... আমরা (ব্রাহ্মগণ) মোসলমানজাতির স্বর্গনরক ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ের মতগত কুসংস্কার পরিত্যাগ কবিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিকাংশ বিষয়ে যেরূপ ঐক্য হইতে পারি অন্য কোন জাতির সঙ্গে সেরূপ নয়। কেননা মোসলমান অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক, কোনরূপ পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদ ইত্যাদির সংস্রব রাখেননা। সুতরাং মোসলাম ভক্ত সাধুদিগের চরিত্রের সঙ্গে আমাদের জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হইতে কোন অন্তরায় নাই।"

মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীন জানিয়েছেন: "এই পুস্তক পাঠ করিয়া কোন কোন হিন্দু, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান বলিয়াছেন যে, মুসলমান সমাজের মধ্যে যে এমন মহাপুরুষ ও সিদ্ধ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে আমরা তাহা অবগত ছিলাম না।" ('ইসলাম-প্রচারক' নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০১; পৃ: ১৮৮)।

খ. তাপসমালা (২য় ভাগ)। প্রকাশক ও মুদ্রক: রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য, ৬ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। প্রকাশকাল: ২৬ এপ্রিল ১৮৮১। মূল্য: আট আনা। পৃ: ৯৮। গ্রন্থস্বত্ব: গ্রন্থকার। দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৮৯০।

গ. তাপসমালা (৩য় ভাগ)। প্রকাশক ও মুদ্রক: রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৮ এপ্রিল ১৮৮২। মূল্য: আট আনা। পৃ: ৮০। দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৮৯২।

ঘ. তাপসমালা (৪র্থ ভাগ)। প্রকাশক ও মুদ্রক: জগবন্ধু ঘোষ, ২০ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৪ জুন ১৮৯৩। মূল্য: আট আনা। পৃষ্ঠা: ৮৭।

ঙ. তাপসমালা (৫ম ভাগ)। প্রকাশক ও মুদ্রক: প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, মঙ্গলাগঞ্জ মিশন প্রেস, ২০ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪। মূল্য: আট আনা। পৃষ্ঠা: ৮৯।

চ. তাপসমালা (৬ষ্ঠ ভাগ)। প্রকাশক ও মুদ্রক: প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, মঙ্গলাগঞ্জ মিশন প্রেস, ২০ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৮৯৫। পৃষ্ঠা: ৷৵.+৵.+১১৮। দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৯০৫।

১৪. কোরআন শরীফ (১ম খণ্ড)। প্রকাশক: গিরিশচন্দ্র সেন, শেরপুর, ময়মনসিংহ। মুদ্রক: তারিণীচরণ বিশ্বাস, চারুযন্ত্র, শেরপুর, ময়মনসিংহ। প্রকাশকাল: ১২ ডিসেম্বর ১৮৮১। মূল্য: চার আনা। পৃষ্ঠা: ২৮। মুদ্রণ সংখ্যা: ১০০০। গ্রন্থস্বত্ব: অনুবাদক।

অনুবাদক আশা করেছিলেন, ১২ খণ্ডে কোরআন শরীফের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ হবে। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত ১২ খণ্ডে এবং কয়েকটি উপখণ্ডে এই অনুবাদের প্রকাশনা সম্পূর্ণ হয়। পরে অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গিরিশচন্দ্র বলেছেন:

"১৮৮১ সালের শেষ ভাগে আমি ময়মনসিংহে যাইয়া স্থিতি করি, সেখানে কোরান শরীফ কিয়দ্দুর অনুবাদ করিয়া প্রতিমাসে খণ্ডশ: প্রকাশ করিবার জন্য সমুদ্যত হই। শেরপুরস্থ চারুযন্ত্রে প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয়, পরে কলিকাতায় আসিয়া খণ্ডশ: আকারে প্রতিমাসে বিধান যন্ত্রে মুদ্রিত করা যায়। প্রায় দুই বৎসরে কোরান সম্পূর্ণ অনুবাদিত ও মুদ্রিত হয়। পরিশেষে সমুদায় একখণ্ডে বাঁধিয়া লওয়া যায়। প্রথমবারে সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা নি:শেষ হইলে পরে ১২৯৮ সালে কলিকাতা দেবযন্ত্রে তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। দ্বিতীয়বারের সহস্র পুস্তকও নি:শেষিত প্রায়। এক্ষণ সংশোধিত আকারে তাহার তৃতীয় সংস্করণের উদ্যোগ হইতেছে।"

('আত্মজীবন', পৃ. ৯১-৯২)।

কোরআন শরীফের অনুবাদ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র জানিয়েছেন:

"আমি আরব্যভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্তি হইলে অনেক বন্ধু বঙ্গভাষায় মূল কোরআন অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে আমাকে অনুরোধ করেন, এ বিষয়ে আমি কোন কোন মোসলমান বন্ধু কর্ত্তৃকও বিশেষরূপে

অনুরুদ্ধ হই। কোরআণ অধ্যয়ন ও তাহা অনুবাদ করাই আরব্য-ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বন্ধুদিগের আগ্রহে ও স্বীয় কর্ত্তব্যানুবোধে ঈশ্বর কৃপায় আমি এক্ষণ কোরআন বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকটন করিয়াছি"। ('ভূমিকা'; কোরআন শরীফ)।

কোরআন শরীফের যথাযথ অনুবাদের বিষয়ে অনুবাদক বিশেষ সচেতন ছিলেন। বলেছেন, "যাহাতে কোরআনের মূল "আয়ত" (প্রবচন) সকলের অবিকল অনুবাদ হয়, তদ্বিষয়ে যথোচিত যত্ন করা হইয়াছে। তদনুরোধে বঙ্গভাষার লালিত্যরক্ষার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে পারা যায় নাই।" গিরিশচন্দ্র-কৃত কোরআন শরীফের প্রথম বঙ্গানুবাদ যথেষ্ট সামাদৃত ও প্রশংসিত হয়। মুসলমান সমাজে এই প্রয়াস অভিনন্দিত হয়।

খ· **কোরআন শরীফ (অখণ্ড)**। সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ: ১২৯৮। প্রকাশক ও মুদ্রক: গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দেবযন্ত্র, ৬৫/২ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য: চার টাকা। পৃষ্ঠা ॥০+।০+৮০০+ ॥৵০ ।০+ ।০+ ১৪।

'দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে' অনুবাদক লিখেছেন: "ঈশ্বর কৃপায় কোরআনের অনুবাদ দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। প্রথমবারের মুদ্রিত সহস্র পুস্তক বহুকাল নিঃশেষিত হইয়াছে। অনেক গ্রাহক পুস্তক চাহিয়া প্রাপ্ত হন নাই। প্রায় তিন বৎসরে দ্বিতীয় সংস্করণের কার্য্য সমাপ্ত হইল। মুদ্রাযন্ত্র নিজের আয়ত্তাধীন না থাকাতে মুদ্রাঙ্কনে ঈদৃশ কাল-গৌণ বহু অসুবিধা হইয়াছে।"

তৃতীয় সংস্করণ: ১৮২৯ শকাব্দ (১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ)। প্রকাশক ও মুদ্রক: কে. পি. নাথ, মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস, ৩ রামনাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য: চার টাকা। পৃষ্ঠা: ৮+৪+১০+৭২০। মুদ্রণ-সংখ্যা: ১০০০।

চতুর্থ সংস্করণ: ২৪ নভেম্বর ১৯৩৬। প্রকাশক: সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৯৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য: ছয় টাকা। পৃষ্ঠা: ৩০+৭২০। ভূমিকা: মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। মুদ্রণ সংখ্যা: ১০০০।

হরফ সংস্করণ: ১ বৈশাখ ১৩৮৬। প্রকাশক: আবদুল আজীজ আল্-আমান, হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

মুদ্রক: ক্যালকাটা প্রিন্টিং হাউস, ৭৯/৯ বি আচার্য জে.সি. বোস রোড, কলিকাতা। মূল্য: পঞ্চাশ টাকা। পৃষ্ঠা: ৬৯+৬৮৩+৪। অনুবাদক জীবনী: সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

১৫. তত্ত্ব-কুসুম। প্রকাশক ও মুদ্রক: রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য. ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ২০ এপ্রিল ১৮৮২। মূল্য: দুই আনা। পৃষ্ঠা: ৩২। মুদ্রণ-সংখ্যা: ৫০০। গ্রন্থস্বত্ব: গ্রন্থকার। 'গোলশানে আসরার' নামক ফারসী গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

১৬. তত্ত্বরত্নমালা। প্রকাশক ও মুদ্রক: রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮২। মূল্য: চার আনা। পৃষ্ঠা: ৪৬। মুদ্রণ-সংখ্যা: ৫০০। 'মনতে কোওয়র' ও জালালুদ্দীন রুমীর সুবিখ্যাত 'মসনবী শরীফ' নামক ফারসী গ্রন্থ থেকে সংকলিত। "১৯১৪ সনে এ বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।" (মুহম্মদ আবদুল হাই: 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'। ৫ম সং: ঢাকা, চৈত্র ১৩৮৫; পৃ: ১৩০)।

১৭. মহাপুরুষচরিত (১ম ভাগ)। প্রকাশক: কে. পি. নাথ, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৮৮৩।

তৃতীয় সংস্করণ: ১৮৩৬ শকাব্দ (১৯১৫)। প্রকাশক ও মুদ্রক: কে. পি. নাথ, মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য: দশ আনা পৃষ্ঠা: ।।০+১২৭। ১ম ভাগে 'অদি বাইবল ও বিশেষ বিশেষ মোহম্মদীয় গ্রন্থ' হতে 'মহাপুরুষ এব্রাহিম, মুসা ও দাউদের জীবনচরিত' সংকলিত হয়েছে।

খ. মহাপুরুষচরিত (২য় ভাগ)। প্রকাশক ও মুদ্রক: রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ৬ জানুয়ারী ১৮৮৪। মূল্য: ছয় আনা। পৃষ্ঠা: ৫২। মুদ্রণ-সংখ্যা: ৫০০। গ্রন্থস্বত্ব: গ্রন্থকার।

গ. মহাপুরুষচরিত (৩য় ভাগ)। প্রকাশক ও মুদ্রক: রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য, ৭২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ২৪ জানুয়ারী ১৮৮৫। মূল্য: দুই আনা। পৃষ্ঠা: ২৭। মুদ্রণ-সংখ্যা: ৫০০। গ্রন্থস্বত্ব: গ্রন্থকার।

১৮. **১৮৮৫ সালের ৮ আইনের সহজবোধ্য বাঙ্গলা অনুবাদ (১ম খণ্ড)।** প্রকাশক: গিরিশচন্দ্র সেন, ঢাকা। মুদ্রণ: অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, ১৩ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ২৪ নভেম্বর ১৮৮৫। মূল্য: এক টাকা। পৃষ্ঠা: ৭৬।

খ. **১৮৮৫ সালের ৮ আইনের সহজবোধ্য বাঙ্গলা অনুবাদ (২য় খণ্ড)।** প্রকাশক: অনুবাদক: মুদ্রক: অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, ১৩ রাম-নারায়ণ ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ২৪ নভেম্বর ১৮৮৫। মূল্য: এক টাকা। পৃষ্ঠা: ৬৫।

১৯. **মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবনচরিত (১ম ভাগ)।** প্রকাশক ও মুদ্রক: রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য, বিধান প্রেস, ৭২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ২৩ জানুয়ারী ১৮৮৬। মূল্য: এক টাকা। পৃষ্ঠা: ১৬৪। মুদ্রণ-সংখ্যা: ৫০০। "হজরত মুহম্মদের মদিনায় হিজরত পর্যন্ত জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। নববিধান কর্তৃক প্রকাশিত মহাপুরুষচরিত সিরিজের অন্তর্গত।" (আলী আহমদ: 'বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী,; পৃ: ৩৮৭)।

এই গ্রন্থ সম্পর্কে মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীনের মন্তব্য: "গিরীশ-বাবুর পূর্বে আর কেহ "হজরতের জীবনী" বাঙ্গালাতে লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়না। খৃষ্টানেরা লিখিতে পারে, কিন্তু সে ত জীবনী নহে—কেবল গালাগালি মাত্র। গিরীশবাবু কৃত "জীবনী" ব্রাহ্ম-দিগের নোট, টিকা-টীপ্পনী ও পরিশিষ্ট বাদ দিয়া পড়িলে, উহা যে উৎকৃষ্ট ও হজরতের জীবনী সম্বন্ধীয় বিস্তৃত পুস্তক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" ('ইসলাম-প্রচারক': নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০১; পৃ: ১৮৮)।

খ. **মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবনচরিত (২য় ভাগ)।** প্রকাশক ও মুদ্রক: রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য, বিধান প্রেস, ৭২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল: জানুয়ারী ১৮৮৭। মূল্য: এক টাকা। পৃষ্ঠা: ১৫৮। "হজরত মুহম্মদ (দঃ)-এর হিজরতের পর প্রথম পাঁচ বৎসরের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।" ('আলী আহমদ': পূর্বোক্ত; পৃ: ৩৮৭)।

গ. **মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবনচরিত (৩য় ভাগ)।** প্রকাশক ও মুদ্রক: রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য, ৭২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

প্রকাশকাল: ২৮ মে ১৮৮৭। মূল্য: এক টাকা চার আনা। পৃষ্ঠা: ২০২। গ্রন্থস্বত্ব: গ্রন্থকার। "হজরত মুহম্মদ (দ:)-এর জীবনের শেষভাগের কাহিনী।" ('আলী আহমদ': পূর্বোক্ত; পৃ: ৩৮৮)।

২০. **পরমহংসের উক্তি**। প্রকাশক ও মুদ্রক: রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য, বিধান প্রেস, ৭২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ২৪ জানুয়ারী ১৮৮৭। মূল্য: দুই আনা। পৃষ্ঠা: ৬৪। গ্রন্থস্বত্ব: ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ, ৫৪ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

২১. **নববিধান প্রেরিতগণের প্রতি বিধি**। প্রকাশক ও মুদ্রক: রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য, বিধান প্রেস: ৭২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ২৪ জানুয়ারী ১৮৮৭। মূল্য: এক আনা। পৃষ্ঠা: ৩৪।

২২. **নববিধান কি ?** । প্রকাশক ও মুদ্রক: রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য, বিধান প্রেস, ৭২ আপার সার্কুলার রোড: কলিকাতা। প্রকাশকাল: ২৪ জানুয়ারী ১৮৮৭। মূল্য: তিন পাই। পৃ: ১১।

২৩. **হদিস মেশকাত মসাবিহ (পূর্ববিভাগ, ১ম খণ্ড)**। প্রকাশক ও মুদ্রক: বিশ্বনাথ দাস, ২০ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ২৪ জানুয়ারী ১৮৯২। মূল্য: আট আনা। পৃষ্ঠা: ৭৩। গ্রন্থস্বত্ব: অনুবাদক।

গিরিশচন্দ্র বিখ্যাত আরবী হাদীস গ্রন্থ 'মেশকাতুল মসাবিহ'-এর বঙ্গানুবাদ করেন। অনেকগুলো খণ্ডে পূর্ববিভাগ ও উত্তর-বিভাগ হিসেবে তাঁর এই অনুবাদ ১৮৯২ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এর শেষ খণ্ড (উত্তরবিভাগ, ৪র্থ খণ্ড) প্রকাশিত হয় ১৮৩০ শকাব্দে (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৮)। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন মন্তব্য করেছেন: "তিনি সর্বপ্রথম মেশকাতের পূর্ণ বাংলা অনুবাদ রচনা ও প্রকাশ করেন।" ("বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা" অখণ্ড ৩য় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৮১; ৩য় খণ্ড: পৃ: ।/০)।

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীনের সূত্রে এই অনুবাদ-গ্রন্থ সম্পর্কে জানা যায়: "ইহার অনুবাদেও আলেমগণ সুখ্যাতি করিতেছেন। বগুড়ায়

নবাব সৈয়দ আবদচ্ছোবহান চৌধুরী সাহেব ৫ম খণ্ডের জন্য ১০০ একশত টাকা অনুবাদককে সাহায্য দিয়াছেন। ৬ষ্ঠ খণ্ডের জন্যও দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।" ('ইসলাম প্রচারক': নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০১; পৃ: ১৮৮)।

২৪. **তত্ত্বসন্দর্ভমালা ১ম ভাগ)**। প্রকাশক ও মুদ্রক: পি.কে. দত্ত, ২০ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ২৭ আগস্ট ১৮৯৩। মূল্য: ছয় আনা। পৃষ্ঠা: ৯২। গ্রন্থস্বত্ব: লেখক। গ্রন্থটিতে 'নববিধানের মূলতত্ত্ব, বিবৃত হইছে।

২৫. **পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত**। প্রকাশক ও মুদ্রক: প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, ২০ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪। মূল্য তিন আনা। পৃ: ৬৪। গ্রন্থস্বত্ব: ব্রাহ্ম মিশন অফিস, কলিকাতা।

এই গ্রন্থে রামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনসহ ১৮৪টি বাণী সংকলিত হয়েছে। ডক্টর সুকুমার সেন এই গ্রন্থটিকে গিরিশচন্দ্রের "উল্লেখযোগ্য রচনা" বলে অভিহিত করেছেন। ('বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সং কলিকাতা ১৩৭৭; পৃ: ২৭৫)।

২৬. **মাতৃবিয়োগে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস**। প্রকাশকাল: ১৩০৪। মা জয়কালী দেবীর মৃত্যুতে রচিত। গিরিশচন্দ্র বলেছেন "শ্রাদ্ধক্রিয়ার দিন 'মাতৃবিয়োগে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস' নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক ক্রিয়াক্ষেত্রে পঠিত হইয়াছিল। সেই পুস্তিকায় মাতৃচরিত ইত্যাদি কথঞ্চিত বিবৃত হইয়াছে।" ('আত্মজীবন', পৃ: ৮৪)।

২৭. **কাব্য-লহরী**। প্রকাশক: গিরিশচন্দ্র সেন, ঢাকা। মুদ্রক: ভানুচন্দ্র দাস, গেণ্ডারিয়া প্রেস, ঢাকা। প্রকাশকাল: ১৮ জুন ১৮৯৭। মূল্য: চার আনা। পৃ: : ৬০। মুদ্রণ-সংখ্যা: ২০০। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের কবিতা সংকলিত হয়েছে এই পাঠ্য পুস্তকটিতে।

২৮. **কোচবিহার বিবাহের বৃত্তান্ত**। প্রকাশকাল: ১৮৯৭। "কোচবিহার-বিবাহ বিষয়ে যে সকল অপপ্রচার করা হয় প্রত্যক্ষদর্শী-রূপে তাহার খণ্ডন।"

২৯. **ইমাম হসন ও হোসয়ন।** প্রকাশক ও মুদ্রক : কে. পি. নাথ, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশকাল : জানুয়ারী ১৯০১। মূল্য : এক টাকা। পৃষ্ঠা : ১৭০। "রওজতোশ শোহদা নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন মূল পারস্য গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।" মুন্সী জমিরুদ্দীন মন্তব্য করেছেন : "বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতৃগণ যদি এমামদ্বয়ের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনী জানিতে পান, তাহা হইলে একবার এই গ্রন্থখানি পাঠ করুন।" ('ইসলাম-প্রচারক' : নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০১ ; পৃ: ১৮৮)।

৩০. **দরবেশী।** প্রকাশক ও মুদ্রক : কে. পি. নাথ, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯ এপ্রিল ১৯০২। মূল্য : চার আনা। পৃষ্ঠা : ৭২। গ্রন্থস্বত্ব : ব্রাহ্ম মিশন অফিস, কলিকাতা। ইমাম গাজ্জালীর 'কিমিয়ায়ে সাদৎ' গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ 'আকসির-ই-হেদায়েত' থেকে সংকলিত "মোসলমান সাধকদিকের বৈরাগ্যতত্ত্ব ও সাধন-প্রণালীর বিশেষ বিবরণ"।

৩১. **বিশ্বাসী সাধক গিরীন্দ্রনাথ রায়।** প্রকাশক ও মুদ্রক : কে. পি. নাথ, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশকাল : ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৩। মূল্য : চার আনা। পৃ: ৮০।

৩২. **ভারতের ইংরেজ শাসন।** প্রকাশকাল ১৯০৫। প্রবন্ধপুস্তক।

৩৩. **মহাপুরুষ মোহাম্মদ এবং তৎপ্রবর্তিত এছলামধর্ম্ম।** প্রকাশক কে.পি. নাথ, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশকাল : ১০ জানুয়ারী ১৯০৬। মূল্য : বার আনা। পৃষ্ঠা : ১০+১০০।

৩৪. **ধর্ম্ম বন্দুর প্রতি কর্ত্তব্য।** প্রকাশক ও মুদ্রক : কে. পি. নাথ, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। তৃতীয় সংস্করণ, ২২ মার্চ ১৯০৬। মূল্য : দুই আনা। পৃ: ২+৩৮। 'কিমিয়ায়ে সাদৎ' ও 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' নামক ফারসী গ্রন্থ থেকে উপদেশ-বাণী সংকলিত।

৩৫. **চারিজন ধর্ম্মনেতা।** প্রকাশক ও মুদ্রক : কে. পি. নাথ, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯০৬। মূল্য : আট আনা। পৃষ্ঠা : ৮+৮৮। চার খলিফার জীবনকথা।

লেখক সূচনায় বলেছেন 'মক্কাবিজয়ের পর হইতে মোসলমান-দিগের বলবৃদ্ধি রাজ্যবৃদ্ধি ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি হয় ; এসলামধর্ম্ম দিক-

দিগন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং লক্ষ লক্ষ লোক এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। হজরত মোহাম্মদ মদিনায় যাইয়া দশ বৎসর কালমাত্র জীবন-যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকান্তে তাঁহার চারিজন প্রধান প্রচারবন্ধু ক্রমে এস্‌লামমণ্ডলীর নেতৃত্ব ও রাজ্যাধিপত্য লাভ করেন। এই পুস্তকে সেই চারিজন নেতার জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত হইল।

৩৬. ধর্ম্মসাধন নীতি। প্রকাশক ও মুদ্রক: কে পি. নাথ, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশককাল ২৭ জুলাই, ১৯০৬। মূল্য: ছয় আনা। পৃ: ৬১। ইমাম গাজ্জালীর 'কিমিয়ায়ে সাদতে'র উর্দু অনুবাদ 'আকসির-ই-হেদায়াতে'র 'তেরাজ্জোল আবেদিন' ও 'মেফহাজ্জোল আবেদিন' গ্রন্থ হতে নির্বাচিত অংশের অনুবাদ।

৩৭ বরদেশ্বরীচরিত। প্রকাশক ১৩১৩? জ্যেষ্ঠা ভগ্নির জীবনকথা। লেখক বলেছেন: "বরদেশ্বরী দেবীর একখানা জীবন তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়ার দিবস পঠিত হইয়াছিল। পরে তাহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করা গিয়াছে।" ('আত্মজীবন', পৃ: ১৯—৯০)

৩৮. আত্ম-জীবন। প্রকাশকাল কলিকাতা, ১৩১৩ (১৯০৭)। মূল্য?। পৃষ্ঠা ৬+১৪৬।

আত্মজীবনীর ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র লিখেছেন: "নিজের জীবনের বৃত্তান্ত প্রত্যেকে নিজে যে রূপ জানেন এবং যাথাযথ বলিতে পারেন অপর লোকে কখনও সেরূপ জানিতে পারেননা সুতরাং ঠিক বলিতে ও লিখিতে পারেননা। তাহাতে সত্যের অপলাপ হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। একদা কোন বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন ঐহিক লীলা কখন সম্বরণ করিবেন কে জানে? এখনই আপনার জীবনচরিত আপনি নিজে লিখিয়া রাখুন, তাহা হইলে ঠিক লেখা হইবে।..." তখন হইতে আমি উহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।... আমি এই সত্তোর বৎসরের জীবনে সুখদু:খ পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বিশ্বাস অবিশ্বাস আলোকঅন্ধকারাদি পরস্পর বিপরীত ও বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছি।...... আমি স্বীয় জীবনে প্রেমময় বিধাতার জীবন্ত প্রেমের লীলা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি জগতে স্বয়ং তাহার সাক্ষ্য দান করার উদ্দেশ্যে এই আত্মজীবন পুস্তক লিখিলাম।

ইহা আমার আত্মীয় অন্তরঙ্গ লোকদিগের হস্তে সমর্পিত হইতে পারিবে, আমার জীবদ্দশায় সাধারণের নিকটে প্রচার এবং পত্রিকাদিতে সমালোচিত হওয়া প্রার্থনীয় নহে।”

৩৯. **মহালিপি (১ম খণ্ড)**। প্রকাশকাল: ১৯০৮। পৃষ্ঠা: ৪+২+৫১। “পরম সাধু মখদুম শরফোদ্দিন আহমদ মনিরী কর্তৃক পারস্যভাষায় লিখিত মূল শততম পত্রাবলীর ভিতর দশটীর বঙ্গানুবাদ।”

৪০. **সতীচরিত**। প্রকাশক ও মুদ্রক: কে. পি. নাথ, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। তৃতীয় সংস্করণ: ১৮৩২ শকাব্দ (১৯১১খ্রীষ্টাব্দ)। মূল্য: ছয় পাই। পৃষ্ঠা: ১৩। পরলোকগতা মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা।

৪১. **চারিটী সাধ্বী মোসলমান নারী**। প্রকাশক: কে. পি. নাথ, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৩। মূল্য: চার আনা। পৃষ্ঠা: ২+৫৬। “দেবী খাদিজা, ফতেমা, আয়েশা ও তপস্বিনী রাবেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রাচীন পারস্য গ্রন্থ মেরাজোল নবুওয়ত এবং তেজকরতোল আউলিয়া হইতে সঙ্কলিত।”

৪২. **কোরানের রচনাবলী**। গিরিশচন্দ্রের ‘আত্ম-জীবনে’ উদ্ধৃত ‘উইলপত্রে’ এই বইটি প্রকাশিত বলে উল্লেখ আছে।

৪৩. **ঈশ্বর কি ঈশ্বর?** ধর্মতত্ত্ব-বিষয় প্রকাশিত পুস্তক। গিরিশচন্দ্রের ‘উইল-পত্রে’-এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

৪৪. **প্রকৃত ধর্ম্ম**। এই গ্রন্থ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বলেছেন: “বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে ময়মনসিংহ নগরে স্থিতিকালে একবার আমি ছুটী উপলক্ষে নিজালয়ে যাইয়া কতিপয় আত্মীয় যুবাকে আহ্বান করিয়া আনিয়া “প্রকৃত ধর্ম্ম” বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলাম। পরে সেই বক্তৃতার মর্ম্ম লিখিয়া পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করা গিয়াছিল।” (‘আত্ম-জীবন’, পৃ: ৮২)।

উর্দু পুস্তক

১. **মজহবে হক্কানি**। প্রকাশক: লালা রলারাম ভেনভাট, ব্রাহ্মসমাজ, লাহোর। উর্দু বক্তৃতার পুস্তকরূপ। মূল্য: এক আনা।

২. **ইমান ক্যা চিজ হ্যায়।** প্রকাশক: লালা রলারাম ভেনভাট, ব্রাহ্মসমাজ, লাহোর। মূল্য: এক আনা।

৩. **নয়ি শরিয়ত ক্যা হ্যায়।** প্রকাশক: লালা রলারাম ভেনভাট, ব্রাহ্মসমাজ, লাহোর। মূল্য: দুই আনা।

৪. **ব্রাহ্মধর্ম্মকা দস্তুরল্ আমল।** 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান' পুস্তকের উর্দু অনুবাদ। প্রকাশক: লাহোর ব্রাহ্মসমাজ। মূল্য: দুই আনা।

৫. **তালিমোল ইমান।** 'ধর্ম্মশিক্ষা' পুস্তকের উর্দু অনুবাদ। প্রকাশক: লাহোর ব্রাহ্মসমাজ। মূল্য: দুই আনা।

৬. **আস্রারে এবাদত।** প্রকাশকাল: পাটনা, ১৮৯৯। উর্দু বক্তৃতার গ্রন্থরূপ।

৭. **হক্তালা গায়েব নহী বল্‌কে হাজের হ্যায়।** প্রকাশকাল: ১৯০৬। "....স্বর্গগত বিশ্বনাথ রায় কর্ত্তৃক স্থাপিত অযোধ্যা-ব্রাহ্মসমাজের প্রচার-ভাণ্ডারের সাহায্যে সম্প্রতি লাহোরে মুদ্রিত হইয়াছে।" ('আত্ম-জীবন', পৃ: ৭৫)।

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা

যে-সব পত্র-পত্রিকায় গিরিশচন্দ্র লিখতেন তা আজ দুষ্প্রাপ্য। এখানে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাবলীর একটি অতি ক্ষুদ্র অংশের উল্লেখ করা হলো।

১. বর্ম্মাদেশ ও বর্ম্মাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম: 'ধর্ম্মতত্ত্ব', ১৮২৮-২৯ শকাব্দ।

২. পাঞ্জাবে ধর্ম্মপ্রভাব: 'ধর্ম্মতত্ত্ব', ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ।

৩. তুহ্‌ফতুল মোহায়েদিন (রাজা রামমোহন রায়ের ফারসী গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ): 'ধর্ম্মতত্ত্ব', ১৮২০-২১ শকাব্দ।

৪. প্রচার-বৃত্তান্ত: 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'মহিলা' পত্রিকায় প্রকাশিত। এই প্রচার-বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে 'নব্যভারত' পত্রিকার মন্তব্য: "প্রচারক হইবার পর যে সকল স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন, সেইসকল স্থানের ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিতেন। সেগুলি পড়িতে বড় মনোরম।" (ভাদ্র ১৩১৭: পৃ: ২৮১)।

রাজনৈতিক চিন্তাধারা, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও গিরিশচন্দ্র

রাজনৈতিক চিন্তাধারা

গিরিশচন্দ্রের রাজনৈতিক মতামত ও চিন্তাধারা কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁর রক্ষণশীল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে অকৃত্রিম রাজানুগত্য ও রাজস্তুতিতে। রাজভক্তি সম্পর্কে তাঁর উপদেষ্টা ও ধর্মগুরু কেশবচন্দ্রের অভিমত ছিলো:

> আইনকে গ্রহণ করিব, বিচারকের ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রভুত্বকে মান্য করিব। যাহাতে সুশাসনপ্রণালী ও সুব্যবস্থা রক্ষা হয় আমি তাহার চেষ্টা করিব। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না রাজভক্তি ব্যক্তিগতভাবে পরিণত হয়, ততক্ষণ আমার অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইতেছে না।... হিন্দুর নিকট রাজভক্তির ব্যক্তি-গতভাবে রাজাকে ভালবাসা ও শাসনবিভাগের কর্ত্তার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা।...... আমি তেজের সহিত বলিতেছি, মনুষ্যের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ রাজাকে সাধারণের পিতৃরূপে দর্শন করে। তিনি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ না হইতে পারেন তাহার শাসনপ্রণালী দোষশূন্য না হইতে পারে তথাপি সাধারণলোকে তাঁহাকে ভক্তি করে, যেমন সন্তান তাহার পিতার দোষদুর্ব্বলতা বিচার না করিয়া তাঁহাকে ভক্তি করে।...... আমরা যতই রাজভক্ত হইব, ততই আমরা আমাদের শাসনকর্ত্তাদের সাহায্যে নৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব।[৪৮]

ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও (১৮৪০-১৯০৫) এই একই সুরে বলেছেন:

> ইংরাজদিগের ভারত অধিকারকে পরম আশীর্ব্বাদ মনে করি। তাঁহারা এদেশে বহুকাল রাজত্ব করুন, ইহা কামনা করি। হে রাজাধি-রাজ, হে প্রজাপতি, তোমাকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বীকার করি যে, তুমি আমাদের ভাবী উন্নতি উদ্দেশ্যে পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন করিলে। এই বীর্য্যশালী সর্ব্বত্রজয়ী জাতির নিকটে এত জ্ঞান, সভ্যতা

ও মনুষ্যত্বের উচচ আদর্শ শিখিলাম যাহা পূর্ব্বে কখনো জানি নাই, ভাবি নাই।[৫৯]

গিরিশচন্দ্রের মন্তব্য এর পাশাপাশি উদ্ধৃত করলে বোঝা যাবে উপরিউক্ত ধারণার সঙ্গে তাঁর বিশ্বাসের ঐক্য ও সাদৃশ্য কতটুকু:

আমরা কি আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানোন্নতি সভ্যতা স্বাধীনতা সুখ-সুবিধা কুশল শান্তির জন্য জ্ঞানোন্নত সভ্য ইংরাজ জাতির নিকটে প্রভূত উপকৃত ও ঋণী নহি?...এই দুর্গত পতিত দেশ খ্রীটিশ-শাসনাধীন হওয়া কি ভগবানের বিশেষ কৃপার বিধান নহে? আজ খ্রীটিশশাসনের প্রভাবে পদদলিত পরাধীন জাতির পক্ষে শত শত বিষয়ে উন্নতি, সুখ সচ্ছন্দতা এবং স্বাধীনতার পথ মুক্ত হইয়াছে, আমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ ও অস্বাভাবিক না হইলে কি ইহা অস্বীকার করিতে পারি?[৬০]

ইংরেজশাসনে দেশ, সমাজ ও ধর্মের উন্নতি সম্পর্কে তাঁর গভীর আস্থা ও বিশ্বাস ছিলো। রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে বাঙালীসমাজ যে বিশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সে-কথা তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন:

প্রবল ইংরাজজাতির সঙ্গে দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতির অসদ্ভাব, বিচ্ছেদ ও শত্রুতা এদেশের পক্ষে সামান্য অনিষ্টজনক নহে। মস্তক প্রস্তরফলকে আঘাত করিলে মস্তকই আহত ও ক্ষতবিক্ষত হয়, সুদৃঢ় প্রস্তরফলকের কিছুই হয়না। প্রবলজাতির সঙ্গে দুর্ব্বল জাতি বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে দুর্ব্বল জাতিরই ক্ষতি হয়। স্কুলের অত্যাচারী বালকগণ রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে মারামারি করিয়া জেল খাটিয়া আইসে, এদিকে তাহাদিগকে martyr বলিয়া প্রশংসা করিয়া মাথায় তোলা হয়, পুরস্কার দেওয়া হয়। কোন কোন বালিকা স্কুলের ক্ষুদ্র ছাত্রী পর্য্যন্ত গভর্ণরকে অপমান করিতে উদ্যত হইয়াছে, কতদূর স্পর্দ্ধা।[৬১]

গিরিশচন্দ্র বরাবর রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধানের অনেক সদস্য বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন তিনি তখন এ-বিষয়ে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হন এবং এই কাজ যে জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নয় সে-সম্পর্কে বলেন:

নববিধানের মূলমতের অন্তর্গত রাজভক্তি একটি মত। যাঁহারা নববিধান মানেন, তাঁহারা রাজভক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপারে যোগদান করিতে

পারেননা। প্রতিবাদ ও আন্দোলন সাধারণ সমাজের জন্য। তাঁহারা এই ব্যাপারে উৎসাহী ও অগ্রণী হইবেন আশ্চর্য্য নহে। কেননা প্রতিবাদ আন্দোলনই তাঁহাদের জীবন। দুঃখের বিষয় এই রাজনীতি-সম্বন্ধীয় প্রতিবাদ ও আন্দোলনের ব্যাপারে অনেক নববিধানবাদী যোগদান ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মগণ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস-ভাজন ছিলেন, নিজ দোষে তাঁহারা বিশ্বাস হারাইয়াছেন।[৬২]

গিরিশচন্দ্র একদিকে যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের তিরস্কার ভর্ৎসনা করেছেন, অপরদিকে ইংরেজ-সরকারের সহিষ্ণুতা-উদারতার প্রশংসা করেছেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের 'উৎপাত', রাজপ্রতিনিধি ও রাজ-জাতির প্রতি আন্দোলনকারীদের 'আক্রোশ, নিন্দা ও দোষ ঘোষণা'র পরিপ্রেক্ষিতে দুঃখিত গিরিশচন্দ্র বলেছেন:

> সকলে কৃতঘ্ন হইলেন, উপকারীর উপকার ভুলিয়া গেলেন, কেবল ছিদ্রান্বেষণ ও কুৎসানিন্দা রটনায় প্রমত্ত হইলেন; ইহা ভাবিলেন না যে, নিজেদের কোন ক্ষমতা নাই, সকল ক্ষমতা গভর্ণমেন্টের হস্তে। উদার গভর্ণমেণ্ট দয়া ও উপেক্ষা করিয়া এ সকল বিরুদ্ধ ব্যাপার হইতে দিয়াছেন। নিবারণে হস্তক্ষেপ করেন নাই।[৬৩]

স্বদেশী আন্দোলনের কালে বাল গঙ্গাধর তিলক 'শিবাজী উৎসব' পালন করার জন্যে কলকাতায় আসেন। তিনি গোলদিঘিতে বিরাট সভা করেন এবং সেইসঙ্গে ইংরেজবিরোধী আন্দোলন ব্যাপক করে তোলার জন্যে উত্তেজনাকর প্রচারপত্র বিলি করেন। গিরিশচন্দ্র বলেছেন, এই আন্দোলন কঠোরহস্তে দমন করার পূর্ণ শক্তি সরকারের থাকলেও তাঁরা তা ব্যবহার করেননি। গিরিশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেছেন: "কত উদারতা! কত ক্ষমা! প্রজার স্বাধীনতার প্রতি কত সম্মানপ্রদর্শন?"

গিরিশচন্দ্র সাধারণভাবে দেশবাসীর এবং বিশেষভাবে ব্রাহ্মসমাজের কোনরূপ ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ অনুমোদন করেননি। তিনি ইংরেজসমর্থক ব্রাহ্মদের প্রতি আন্দোলনসমর্থক ব্রাহ্মদের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে 'কুৎসিত দলাদলি' বলে অভিহিত করেছেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকে তিনি ইংরেজজাতির প্রতি 'অসদ্ব্যবহার' বলে বিবেচনা করেছেন। ইংরেজশাসনকে তিনি বিকল্পহীন অপরিহার্য বলে মনে

করেছেন। কৃতজ্ঞ রাজভক্তের দৃষ্টি থেকে তিনি বলেছেন :

> বিলাতের সঙ্গে ইংরেজ জাতির সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া যে একটি দিনও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার উপায় নাই।...এদেশের বর্ত্তমান শিক্ষাসভ্যতা সভাসমিতি বক্তৃতা পত্রিকা মুদ্রাযন্ত্রাদি সমুদায় বিলাত হইতে কি ধার করা নয়? সকল বিষয়ে কি এদেশ বিলাতের নিকট ঋণী নহে? কত অসংখ্য বিষয়ে আমরা বিলাতের নিকটে, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকটে ঋণী।
>
> যাহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার লেশ আছে সে এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারেনা। আজ disloyal বলিয়া সর্ব্বত্র বাঙ্গালী জাতির দুর্নাম হইয়াছে।[৬৪]

রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্র ও যুবসমাজের সংযুক্তি ও অংশগ্রহণ যে তাদের ও দেশের পক্ষে ক্ষতিকর সে-কথা বোঝানোর জন্যে গিরিশচন্দ্র রাজভক্ত বিবেকবান দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। বলেন তিনি :

> আপনি একজন জনহিতৈষী, সদাশয় ও মহাশয় ব্যক্তি। যুবক ও বালকগণ আপনার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত মান্য করিয়া চলে। যাহাতে তাহাদের মনে বিনয়, সদ্ভাব ও কৃতজ্ঞতা বর্দ্ধিত হয়, ইংরাজজাতির সঙ্গে বাঙ্গালীর বিচ্ছেদের রেখা দৃঢ়ভূত না হয়, তাঁহাদের ছিদ্রান্বেষণ ও নিন্দাচর্চা না করিয়া যেন তাহারা তাঁহাদের গুণ গ্রহণ ও উপকার স্বীকার করে, রাজনৈতিক আন্দোলনে মত্ত বালকবালিকারা স্বাভাবিক নম্রতা ও কোমলতা বিসর্জন দিয়া লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া যেন অস্বাভাবিক ভাব ধারণ না করে, তাহারা যেন বক্তৃতার পূজা না করিয়া সুনীতি ও চরিত্রের পূজা করে, প্রার্থনা করি আপনি সযত্নে সেই পথ প্রদর্শন করিবেন।[৬৫]

গিরিশচন্দ্র সারাজীবন একজন অকৃত্রিম রাজভক্তের বিশ্বস্ত ভূমিকা পালন করে গেছেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও গিরিশচন্দ্র

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ও মূল্যায়ন

ব্যতিক্রমধর্মী এবং তা রাজভক্তি ও আঞ্চলিকতাবাদী মানসিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[৬৬]

গিরিশচন্দ্র তাঁর 'আত্ম-জীবন' গ্রন্থের 'রাজনৈতিক আন্দোলন বিষয়ে মন্তব্য' অধ্যায়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ব্যক্তিগত ধারণা ব্যক্ত করেন। তাঁর বক্তব্য ঋজু, অকপট, স্বাধীন ও আন্তরিকতালালিত। এখানে তাঁর বক্তব্যের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হলো :

> কিঞ্চিন্ন্যূন দুই বৎসর হইতে চলিল রাজপ্রতিনিধি লর্ড কুর্জ্জন মহোদয়ের বঙ্গবিভাগ কার্য্যোপলক্ষ করিয়া বঙ্গদেশে ভীষণ আন্দোলন ও প্রতিবাদ চলিয়াছে। কতকগুলি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও কতিপয় বক্তা এই প্রতিবাদ ও আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। সম্পাদকগণ পত্রিকায় আন্দোলন করিয়া, বক্তারা স্থানে স্থানে যাইয়া লোকসংগ্রহপূর্ব্বক বক্তৃতা করিয়া রাজপ্রতিনিধির নূতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণের মনকে উত্তেজিত করেন।..... ইহা দেখিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিল। আমি বঙ্গবিভাগনীতির বিপক্ষ নহি, বরং স্বপক্ষ। আমার বিশ্বাস এতদ্বারা পশ্চাৎপদ অনুন্নত ও নানা অভাবগ্রস্ত পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ কল্যাণ ও উন্নতি হইবে। ঢাকা রাজধানী এবং পূর্ব্ববঙ্গের সীমান্তবর্ত্তী বঙ্গোপসাগরের অদূরস্থ চট্টগ্রাম নগর বিশেষ বাণিজ্যস্থান হইতে চলিল, পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগের অর্থাগমের পথ মুক্ত হইল। সে দেশে রাজকীয় প্রধান প্রধান কার্য্যালয় সকল স্থাপিত ও বাণিজ্যের প্রসার হইবে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, আসাম প্রদেশও পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে। ইহা ভাবিয়া আমার আহলাদ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কথা ছাড়িয়া দি, বাঙ্গালিদিগের উন্নতিদর্শন অনেকের চক্ষুঃশূল হইতে পারে। কলিকাতা অঞ্চলে পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী কৃতবিদ্য লোকেরা কোন অফিসে তাঁহাদের কর্ত্তৃক বাধা পাইয়া সহজে প্রবেশ করিতে পারেনা। এখানকার কেরানীগিরী প্রভৃতি কাজ একপ্রকার এখানকার লোকেরাই একচেটিয়া হইয়া রহিয়াছে।[৬৭]

গিরিশচন্দ্র বিশেষ যুক্তি ও কারণ প্রদর্শন করে বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে তাঁর দৃঢ় মত প্রকাশ করেছেন। বঙ্গবিভাগকে সমর্থন করাকে তিনি তাঁর নৈতিক

কর্তব্য বলে মনে করেছেন:

> রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গ-শাসনের নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গদেশের অকল্যাণ, পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বিচ্ছেদ ঘটিবে, একটি দুঃখের ব্যাপার হইবে, এই আশঙ্কা; তৎস্মরণার্থ বাবু বিপিন পাল প্রমুখ ব্যক্তিগণ অরন্ধন ব্রতের বিধি সাধারণের জন্য প্রচার করিয়াছেন। ইহা একটি দুঃখব্রত। আমার মনে সেই আশঙ্কা কিছুই হইতেছে না, বরং তদ্বিপরীত পূর্ব্ববঙ্গের কল্যাণ হইবে, সে দেশ নানা বিষয়ে পশ্চাদ্-গামী ও অনুন্নত, এক্ষণ হইতে অগ্রসর ও উন্নত হইবে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার জন্মস্থান ঢাকার জিলায়, সে স্থানে আমার বাসগৃহ, আমি ঢাকানিবাসী। ঢাকা রাজধানী হইল, ঢাকা অঞ্চলের অনেক বিষয়ে উন্নতি হইতে চলিল, ইহাতে আমার দুঃখ না হইয়া বরং আনন্দ হওয়াই স্বাভাবিক। অরন্ধনব্রতরূপ দুঃখব্রত পালন করিলে আমাব পক্ষে অসত্যা-চরণ ও অধর্ম্ম হয়।[৬]

বঙ্গভঙ্গের ফলে অবহেলিত পূর্ববঙ্গের সার্বিক উন্নতি ও প্রশাসনিক সুবিধা হবে এ-কথা গিরিশচন্দ্র গভীরভাবেই বিশ্বাস করতেন। এই বিভক্তি-রদের আন্দোলনের নেতৃত্ব যে মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক ছিলো তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। বঙ্গবিভাগ মাতৃঅঙ্গচ্ছেদ, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ,—এইসব আবেগশাসিত যুক্তি ও বক্তব্য খণ্ডন করে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন:

> নূতন রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের বিচ্ছেদ ঘটিল বলিয়া যত আর্তনাদ ও আন্দোলন। কিন্তু সম্বৎসরেরও অধিককাল অতীত হইয়াছে কি যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, কি যে অনিষ্ট হইয়াছে, ইতিমধ্যে তাহার লক্ষণ কিছুই দেখিতে পাওয়া গেলনা। উভয় প্রদেশের বক্তা ও লেখকগণ সম্মিলিতভাবে উৎসাহসহকারে রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেছেন, রেলওয়ে ও ষ্টীমারাদিযোগে পূর্ব্ববৎ উভয় প্রদেশে সম্মিলিত-ভাবে বাণিজ্যাদি চলিতেছে, প্রত্যহ সহস্র সহস্র নরনারীর অবাধে গমনাগমন হইতেছে, বিবাহাদি সম্বন্ধযোগে উভয় প্রদেশবাসী লোকের সঙ্গে পরস্পর ঘনিষ্ঠ কুটুম্বতা চলিয়াছে, তাহার একবিন্দুও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। অঙ্গচ্ছেদ কেমন করিয়া বুঝা যায়।. . . . পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম-

বঙ্গের পরস্পর একতাবন্ধন জন্য কবির মস্তিষ্কসম্ভূত—কল্পনাজাত উপায় অরন্ধন নিয়ম ও রাখিবন্ধন অবলম্বিত হইয়াছে, ইহাতে কেবল ইংরেজ-জাতির সঙ্গে বিচ্ছেদই বৃদ্ধি পাইবে।[৬৯]

বঙ্গবিভাগের অনিবার্যতা, শাসনকার্যের সুফল, পূর্ববঙ্গের উন্নতির সম্ভাবনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাঁর স্বাধীন বক্তব্য পেশ করে আলোচনার উপসংহারে গিরিশচন্দ্র বলেছেন:

আমি গত বৎসর আন্দোলনমত্ত বিপিন পাল প্রভৃতির প্রচারিত "অরন্ধন নিয়ম" এবং "রাখিবন্ধন" বিধি পালন করি নাই। তাহাতে কোনরূপ যোগদান ও সহানুভূতি প্রকাশ করি নাই। কেননা ঢাকা নগরে রাজ-ধানীর সূত্রপাত আমার দুঃখের কারণ হয় নাই, বরং আনন্দের কারণ হইয়াছে।[৭০]

বঙ্গবিভাগের প্রতিক্রিয়া এবং এর বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন ক্রমশ স্বদেশী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। বিদেশী পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত ও বিটিশ-বিরোধী চেতনা সঞ্চারিত করা এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিলো।

গিরিশচন্দ্র স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের বিপক্ষে ছিলেননা। তিনি নিজেকে 'স্বদেশী' হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন:

আমি কখনও ইংরেজী জুতা পদে স্পর্শ করি নাই, কোনরূপ বিলাতী পোষাক পরি নাই। আমি নিরেট স্বদেশী; স্বদেশী বক্তৃতা শুনিয়া আমি স্বদেশী হই নাই। আমি আমার অন্তরাত্মার উপদেশে চিরকাল চলিয়াছি।[৭১]

কিন্তু 'স্বদেশী উত্তেজনায়' বিদেশী পণ্য বর্জনের মধ্যে যে জাতি ও সরকার বিদ্বেষী নিহিত ছিলো তা তিনি সমর্থন করতে পারেননি। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার তিনি চিরকালই কামনা করেছেন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে 'অতিশয় অকল্যাণজনক' 'অপ্রেম ও হিংসাবিদ্বেষে'র মাধ্যমে 'রাজার উপর প্রজার জোরজবরদস্তি'র ফলে সরকারকে কিছু দমন-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। সরকারের এই কাজ যে অনেকক্ষেত্রেই 'আইনসঙ্গত' হয়নি সে কথা স্বীকার করেও গিরিশচন্দ্র এর কার্য-কারণ

সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বলেছেন :

> কিন্তু আন্দোলনকারীদের উৎপাত ও উপদ্রব কি তাঁহাদের উত্তেজনার কারণ নহে? নিজেদের দোষত্রুটী অন্যায়চারণ কিছুই উল্লেখ না করিয়া বরং গুপ্ত রাখিয়া অনেকস্থানে তিলকে তাল করিয়া গভর্ণমেণ্টের ও ইংরাজজাতির দোষ ঘোষণা কি করা হয় নাই?[৭২]

আবেগ-নিরপেক্ষ হয়ে যুক্তিনিষ্ঠ গিরিশচন্দ্র স্বদেশী পণ্য বর্জনের বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করে বলেছেন :

> এদেশের শিল্পজাতের উন্নতি ও দেশীয় বাণিজ্যের প্রসার হয় ইহা যে একান্ত প্রার্থনীয়, ইহা কে অস্বীকার করিবে? সকলের এ বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ ও যত্নচেষ্টা করা প্রয়োজন। কিন্তু বয়কট ও বিলাতীবর্জ্জন প্রতিজ্ঞার মধ্যে যে বিদ্বেষ বিষ রহিয়াছে তাহাতে প্রভূত অকল্যাণের সম্ভাবনা। বর্তমান যুগে পরস্পর বিনিময় ভিন্ন কোনো জাতির উন্নতি হইতে পারেনা। ইংলণ্ডের দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্যাদি শাস্ত্র পরিত্যাগ করিলে, সে দেশের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা পৃথিবীর যে সকল মহাকল্যাণ সাধিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে যোগ ছিন্ন করিলে কি নিতান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন হতভাগ্য হইয়া পড়িনা? কেবল বিলাতী কাপড় না পরিলে ও বিলাতী লবণ না খাইলে স্বদেশপ্রেমিক হওয়া যায়না। স্বদেশী বস্ত্রের সূত্র বিলাতী, স্বদেশী লবণও বিলাতী-লোকের সাহায্যে আমরা পাইতেছি।...আমরা জাপান ও জর্ম্মনীর দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব, ইংল্যাণ্ডের দ্রব্য ব্যবহার করিবনা, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে ইংরাজ জাতির প্রতি বিদ্বেষ ভিন্ন অন্য কিছু কি বুঝায়?[৭৩]

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যে সামাজিক অসন্তোষ, সহিংস বিক্ষোভ ও আইন অমান্যের প্রবণতা দেখা দেয় তা গিরিশচন্দ্রকে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করেছিল। তাঁর নিজস্ব অবস্থান থেকে এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

> স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ উৎসাহ ও প্রশ্রয় পাইয়া পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে ও কলিকাতায় যে সকল অন্যায় কার্য্য ও অত্যাচার করিয়াছে তাহা আমি দুঃখের সহিত স্মরণ করি।... ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে

ঢিল ছুঁড়িয়া মারা, য়ুরোপীয় মহিলার গায়ে কাদা নিক্ষেপ করা, স্কুলকলেজের নিয়মবিধি অগ্রাহ্য করিয়া চলা, শিক্ষকদিগকে অমান্য করা এমনকি কি মহামান্য রাজ্যাধিপতি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহোদয়কে পর্যন্ত অপমান করা, বিলাতী লবণের নৌকা নদীতে ডুবাইয়া দেওয়া এবং হাট-বাজারে দৌরাত্ম্য করা ইত্যাদি অনেক ছাত্র ও আন্দোলনকারী এইসকল দুর্নীতি প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতেই তদানীন্তন লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর উত্তেজিত হইয়া গোরখা সৈন্য প্রেরণ করেন, তাহারা অত্যাচার করে, পুলিশও অত্যাচার করে, কোন কোন ম্যাজিষ্ট্রেট অন্যায় ও অবিবেচনার কার্য্য করেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর বাহাদুরের ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতাচ্যুতি দুঃখের কারণ হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাহা বলিয়া সংবাদপত্রে অজস্র গালাগালি করা ভদ্রোচিত কার্য্য হইয়াছে? ইহা কি আমাদের শিষ্টতা ও ভদ্রতা?[৭৪]

গিরিশচন্দ্র আন্দোলনকারীদের কথা ও কাজের ঐক্য ও সমন্বয়-সাধনের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি 'স্বার্থত্যাগ ও সৎসাহসের পরিচয়দান-পূর্ব্বক' 'দৃষ্টান্তবিহীন উপদেশ ও বক্তৃতা পরিত্যাগের জন্যে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

গিরিশচন্দ্র এই আন্দোলনের মূল্যায়ন করে বলেছিলেন, এর ফলে ইংরেজের অসন্তুষ্টি বাড়বে এবং তা বাঙালীজাতির সমূহ ক্ষতির কারণ হবে। কেননা, "যে চাকুরী বাঙ্গালী জাতির প্রধান জীবনোপায়, তাহা প্রধানত: গভর্ণমেণ্টের হস্তে, এবং ইংরাজদিগের অনুগ্রহসাপেক্ষ।" ইতো-মধ্যেই এই আন্দোলনের ফলে বাঙালী হিন্দুসমাজ সরকারের 'অবিশ্বাসভাজন' হওয়ায় তার জীবন-জীবিকার সংকটকে সূচনা করেছে। তাই আন্দোলন-কারীদের কথা ও ব্যবস্থানুসারে পরিচালিত হওয়া 'কল্যাণজনক' বলে গিরিশচন্দ্র মনে করতে পারেননি। আন্দোলনের বিপক্ষে তাঁর স্বাধীন ও সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি আন্দোলনকারীদের 'অনুরোধ ও ভয়প্রদর্শন'কে উপেক্ষা করেছেন। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত করে তিনি বলেছেন:

বর্ত্তমান আন্দোলন ও ব্রতের পক্ষে বহু জনতা, তাহাতে যে সমস্ত জিনিষ খাঁটি হইল ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিনা। আমি দেখিতেছি

> যে, এই আন্দোলনের মূলে রাজার প্রতি বিষম বিদ্বেষ ও ইংরাজ-জাতির প্রতি বিদ্বেষ রহিয়াছে।[৭৫]

গিরিশচন্দ্র রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বিরোধিতা ও সমালোচনার পাশাপাশি তাঁর ইংরেজপ্রীতি ও রাজভক্তি প্রচ্ছন্ন রাখেননি। তিনি বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনকারীদের ভর্ৎসনা ও নিন্দা করে ইংরেজ সরকার ও জাতির প্রতি তাঁর অনুরাগ, আস্থা, সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। তিনি সবসময়ই যে-কোন রকমের সরকারবিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলেন। ব্রিটিশ-রাজের প্রতি প্রীতি, আনুগত্য, ভক্তি ও তোষণে তিনি ছিলেন তাঁর যুগের এক অকপট প্রতিনিধি। ক্রমশ: জাতীয়তাবাদী চেতনা ও রাজনৈতিক সচেতনাবোধশাসিত স্বদেশ-প্রেমের যে উন্মেষ ঘটছিলো তা রাজভক্ত গিরিশচন্দ্রকে স্পর্শ বা অনুপ্রাণিত করতে পারেনি।

ব্রাহ্মধর্ম ও গিরিশচন্দ্র

গিরিশচন্দ্র বাল্যকাল থেকেই ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। ধার্মিকতাকে তাঁর জীবনের প্রধান মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। প্রথম জীবনে শুদ্ধ হিন্দুধর্মাচারী এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী হন। তাঁর ধর্ম-বিশ্বাসের দ্বিতীয় পর্বে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক হিসেবে এবং কেশবচন্দ্র-নির্দেশিত ইসলামী শাস্ত্রের চর্চাকার হিসেবে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ধর্মজীবনের প্রথম পর্ব : নিষ্ঠ হিন্দু

গিরিশচন্দ্রের জন্ম এক নিষ্ঠাবান শাক্ত হিন্দু পরিবারে। ঠাকুরপূজা ছিলো তাঁর বাল্যক্রীড়ার প্রধান অনুষঙ্গ। তিনি বলেছেন :

> পিত্তলনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গণেশ ও গোপাল এবং অন্নপূর্ণা মূর্তি ছিল, সে সকল আমা কর্ত্তৃক গৃহের এক প্রকোষ্ঠে সিংহাসনে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যহ প্রত্যূষে এইসমস্ত মূর্তিপূজার জন্য আমি পুষ্প চয়ন করিতাম। স্নান করিয়া বা বস্ত্রপরিবর্তন করিয়া পুষ্প চন্দন ও নৈবেদ্য এবং ধূপ দীপযোগে নিবিষ্ট মনে সেই প্রতিমূর্তি সকলের পূজায় নিযুক্ত

হইতাম।... ঠাকুর-দেবতার প্রতি আমার অগাধ ভক্তি ছিল। আমাদের পরিবারে লক্ষ্মী-গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। বেতনাভোগী পূজক ব্রাহ্মণ প্রতিদিন সেই বিগ্রহের পূজা করে, সেই ঠাকুরপূজার সময় আমি ঠাকুরঘরের দ্বারে উপস্থিত হইতাম, ভক্তিপূর্ব্বক চরণামৃত গ্রহণ ও প্রণাম করিতাম, নৈবেদ্যের চিনি কলা প্রসাদেরও প্রত্যাশী হইতাম।...দোলযাত্রার সময় আমি ঠাকুরকে দোলমঞ্চে আরোহণ করাইতাম।...কিন্তু ক্ষুদ্রাকারে আর দুর্গোৎসব করিয়া উঠিতে পারিতাম না, পারিবারিক দুর্গোৎসবেই উৎসাহ, আনন্দ ও ভক্তি প্রকাশ করিতাম। আমি একক গোঁড়া হিন্দু পৌত্তলিক ছিলাম।[৭]

ছেলেবেলা থেকেই গিরিচন্দ্রের মনে আনন্দ ছুঁৎমার্গ, সংস্কার ভেদজ্ঞান ও রক্ষণশীলতা জন্মলাভ করে। ৯/১০ বছর বয়সে তাঁর মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হয় যে, মুসলমান বা শূদ্রের ছায়া মাড়ালে অপবিত্র হতে হয়। তাঁদের বাড়ীতে করুণা নাম্নী একজন শূদ্র গৃহপরিচারিকা ছিলো। এই করুণার কোলে পিঠেই তিনি মানুষ হন। তাকে ডাকতেনও করুণামাসী বলে। একদিন রাতে খাওয়ার সময় করুণার শাড়ীর আঁচল গিরিশের শরীর স্পর্শ করায় তৎক্ষণাৎ তিনি খাওয়া ছেড়ে উঠে যান। এর কিছুকাল পরে বড়দাদার সঙ্গে নৌকায় ঢাকা যাওয়ার পথে ফতুল্লায় যাত্রাবিরতি করা হয়। বড়দাদা এক দোকানে গিয়ে ফতুল্লার সুপ্রসিদ্ধ পাতক্ষীর ও সরু চিড়ে কিনে আনেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র বহু সাধ্যসাধনা সত্ত্বেও সেই খাদ্যগ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। কেননা ক্ষীর-বিক্রির সময় একজন ফিরিঙ্গী বাজনদার সেই দোকানে প্রবেশ করায় উক্ত ক্ষীর "অপবিত্র" হয়েছিল। আজন্মলালিত এই সংস্কার দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। এমন কি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরও অনেকদিন পর্যন্ত তিনি মুসলমানের তৈরী পাঁউরুটি খাননি এবং 'সভ্যলোকের প্রিয়খাদ্য কুক্কুট মাংস জীবনে কোনদিন রসনায় স্পর্শ' করেননি।

গিরিশচন্দ্রের বয়স যখন ১২/১৩ বছর তখন তিনি মুড়পাড়ানিবাসী বিশ্বনাথ কুলগুরু পঞ্চাননের কাছে দীক্ষা নিয়ে শিবমন্ত্র গ্রহণ করেন। পরম ভক্তিসহকারে প্রত্যহ শিবপূজা করতেন। তাঁর 'পূজার নিষ্ঠা ও হিন্দুওয়ানি' এবং 'দেবদ্বিজ ভক্তি' প্রত্যক্ষ করে তাঁর এক আত্মীয় মন্তব্য করেছিলেন,

"আমাদের বংশে" একজন ধার্ম্মিক লোক হইবে। অবশ্য এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, ক্রমশ ধর্মনিষ্ঠা শিথিল হয়ে আসে। জানাচ্ছেন তিনি:

> কিয়ৎকাল পরেই আমার শিবপূজার প্রতি ভক্তিনিষ্ঠার হ্রাস হয়, আমি প্রাত্যহিক পূজা হইতে নিবৃত্ত হই, পুষ্পচন্দন বিল্বপত্রযোগে রীতিমত শিবপূজা না করিয়া ত্রিসন্ধ্যা সংক্ষিপ্ত আহ্নিকমাত্র করিতে থাকি। এই অবস্থায় আমি ছোটদাদার সঙ্গে ময়মনসিংহ নগরে যাইয়া অবস্থান করি। সেখানে যাওয়ার পর আমি আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়া স্নানান্তে কেবল মূলমন্ত্র "নমঃ শিবায়" কয়েকবার জপ করিতে থাকি। আমাদের পরিবারে শিবমন্ত্র-গ্রহণের কিয়দ্দিন পরে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার রীতি। বড়দাদা ও ছোটদাদা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, আমি প্রথম গৃহীত শিরপূজাই পরিত্যাগ করিলাম, শক্তিপূজা আর গ্রহণ করিব কি? অল্পদিন পরে আমি মূলমন্ত্র জপও ত্যাগ করিলাম। হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত পূজার্চনায় আস্থা আমার অন্তরে আর স্থান পায় নাই। ঈশ্বর আছেন, আমি এইমাত্র বিশ্বাস করিতাম, তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হই নাই।[১১]

হিন্দুধর্মের আচরিক দিকগুলো সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র ক্রমশ উদাসীন হয়ে পড়েন। হিন্দুধর্মে আস্থা টলে উঠেছে; কিন্তু অন্য কোনো ধর্মবিশ্বাসও স্থাপিত হচ্ছেনা—এইরকম একটা অবস্থা বেশ কিছুকাল স্থায়ী হয়েছিল। এই সময় ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে তাঁর বিরূপতাও তিনি প্রচ্ছন্ন রাখেননি।

ধর্মজীবনের দ্বিতীয় পর্ব : ব্রাহ্মসমাজ

ময়নমসিংহে অবস্থানকালে গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মসমাজ ও তার সদস্যদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেননা। ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের শিক্ষক ঈশানচন্দ্র বিশ্বাসের প্রচেষ্টায় এখানে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। জেলা-স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক ভগবানচন্দ্র বসুর বাসায় সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যার পর ব্রহ্মোপসনা হতো। গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মদের প্রতি 'হাড়ে চটা' ছিলেন। তাঁর ভগ্নিপতি কালীনারায়ণ গুপ্ত ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হলে তিনি তাঁর প্রতি 'অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের ব্রাহ্ম বিদ্বেষ এতো প্রবল ছিলো যে ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের (১৮২০—১৮৯১) সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক আছে এমন সংবাদ শুনে তাঁর প্রতি গিরিশের 'অন্তরে অতিশয় অশ্রদ্ধা জন্মে' এবং বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ স্পর্শ করতেও তাঁর বিতৃষ্ণা জাগে। ব্রহ্মোপসনায় উপাচার্যের গ্রন্থ-পাঠের সময় ব্রাহ্মসদস্যদের চক্ষু মুদ্রিত করে তা শ্রবণ করার বিষয় নিয়ে তিনি কৌতুক বিদ্রূপ করতেও ছাড়েননি। এইসব প্রত্যক্ষ করে গিরিশচন্দ্রের ভগ্নিপতি কালীনারায়ণ গুপ্ত মন্তব্য করেন, মরুভূমিতে ফুলের বাগান সৃষ্টি হয়তো সম্ভব, কিন্তু এঁর কঠিন হৃদয়ে ব্রাহ্মসমাজের বীজ অঙ্কুরিত হওয়া অসম্ভব। সেইসময়ে তিনি ধর্মের পুরনো বিশ্বাসগুলো হারিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু নতুন কোনো বিশ্বাস খুঁজে পাচ্ছেননা এই মনোসংকট সম্পর্কে বলেছেন তিনি: "তখন আমার কোন ধর্ম্মে কোনরূপ বিশ্বাস ছিলনা, আমি একজন অদ্ভুত জন্তুর স্বভাব ধারণ করিয়াছিলাম।"[১৮]

মুড়াপাড়ার জমিদার ময়মনসিংহ কালেক্টরীর খাজাঞ্চি রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্রের ছোটদাদা হরচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। দাদার সূত্রে তিনিও এই পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগলাভ করেন। এইসময় রামচন্দ্রের বৈঠকখানায় অস্থায়ীভাবে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার কাজ হতো। এই উপাসনাসভায় তিনি নিয়মিত যোগ দিয়ে 'মহর্ষিকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান শুনতেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর মানস-রূপান্তর ঘটে, তার ভাষায়: "তদবধি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি আমার অন্তর হইতে বিদ্বেষ বিদূরিত হইল" এইভাবে ব্রাহ্মবিদ্বেষী গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হন।

১৭৮৭ শকাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে কেশবচন্দ্র সেন ময়মনসিংহে আসেন এবং এর দু'বছর পর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও প্রচার উপলক্ষে এখানে আসেন। ব্রাহ্মসমাজের এই দুই নেতৃপুরুষের সাহচর্য ব্রাহ্মধর্মের প্রতি গিরিশচন্দ্রের অনুরাগকে আরো দৃঢ় করে। তিনি সক্রিয়ভাবে ব্রাহ্মসমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তখনো তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজের মণ্ডলীভুক্ত হননি। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার পরের বছর পৌষ মাসে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রাণপুরুষ বঙ্গচন্দ্র রায়ের কাছে নিজের বিশ্বাস স্বীকার করে মণ্ডলীভুক্ত হন।

ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পর গিরিশচন্দ্রকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে যথেষ্ট নিন্দা, সমালোচনা ও অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

তখন তিনি ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের পণ্ডিত' জেলা স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক পার্বতীচরণ রায়ের সঙ্গে 'একত্র বাস একত্র ভোজন' করছিলেন। প্রথমে গৃহকর্ত্রী অন্তঃপুরে তার আহার বন্ধ করে দিলেন। বাইরের ঘরে পাঠানো খাওয়ার থালা-বাসন তাঁকেই ধুতে হতো। কিন্তু অচিরেই আহারের ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেলো। তখন গিরিশচন্দ্র স্বপাক আহার আরম্ভ করলেন। একজন চাকর নিয়োগ করলেও গৃহকর্ত্রীর অত্যাচারে সে কয়েকদিনের মধ্যেই পালিয়ে যায়। এমন কী ময়মনসিংহের অনেক ব্রাহ্মবন্ধুও প্রকাশ্যে গিরিশ-চন্দ্রের সঙ্গে জলযোগ করতেও সাহস পাননি। প্রায় একঘরে অবস্থায় তাকে বাস করতে হয়। সপরিবারে বসবাসের জন্যে কোনো বাড়ি ভাড়া পাননি। স্ত্রীর সন্তান প্রসবকালে কারো সাহায্য না পাওয়ার আশঙ্কায় তাঁকে ঢাকায় স্থানান্তর করতে হয়েছে।

পরিবারের কোনো আত্মীয়স্বজনও গিরিশচন্দ্রের ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হওয়াকে সমর্থন করেননি। তার মা ও বড়দাদা 'অবৈধ উপায়ে' তাঁকে সমাজে পুনরায় গ্রহণের জন্যে চেষ্টা করেন। প্রতিকূল অবস্থায় একমাত্র তার স্ত্রী ব্রহ্মময়ী তাঁর সহায় ছিলেন এবং ধর্মবিশ্বাসে স্বামীর অনুগামিনী হয়েছিলেন। স্ত্রীর সমর্থন, উৎসাহ ও সহানুভূতি তাঁকে শেষপর্যন্ত সকল সংকট উত্তরণে সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছে।

ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের সম্পর্ক একসময় ক্ষুণ্ন হয়। পশ্চিমাঞ্চল সফর শেষ করে ময়মনসিংহে ফিরে এসে লক্ষ্য করেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবশালী সদস্য ও গিরিশচন্দ্রের একজন পরম বান্ধব গোপীকৃষ্ণ সেন তাঁর প্রতি বৈরী আচরণ করছেন। উপাচার্য হিসেবে তিনি সামাজিক উপাসনার সময় যে প্রার্থনা ও উপদেশ দিতেন গোপীকৃষ্ণ তার প্রতিবাদ মূলক প্রার্থনা ও উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। গোপীকৃষ্ণ তাঁকে বেদী-চ্যুত করার চেষ্টাও করেন, কিন্তু উপাসকমণ্ডলীর সমর্থন না পাওয়ায় তাতে সফল হননি। তিনি এই দ্বন্দ্ব-বিবাদ পরিহারের জন্য ময়মনসিংহ ছেড়ে কলকাতা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি শিক্ষকতার কর্মও ত্যাগ করা স্থির করেন। ১৮৭৫ সালে তিনি ময়মনসিংহ থেকে কলকাতায় চলে যান এবং ১৩ মীর্জাপুর স্ট্রীটে অবস্থিত কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রমে

আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইসময় তিনি কেশবচন্দ্র সেনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং ব্রাহ্মসমাজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হন।

১৮৭৮ সালের ৬ মার্চ কুচবিহার-বিবাহকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজে ব্যাপক আলোড়ন উপস্থিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন প্রবল সমালোচনা, নিন্দা ও আক্রমণের সম্মুখীন হন। ফলে ব্রাহ্মসমাজ পুনরায় বিভক্ত হয়। কেশ চন্দ্রের অধিকাংশ সুহৃদ, সহযোগী ও শিষ্য তাঁকে ত্যাগ করেন। অনেক ক্ষেত্রেই কেশবপন্থীরা বিরুদ্ধবাদীদের হাতে বেদীচ্যুত এবং নাজেহাল হন। ব্রাহ্মসমাজের এই সংকটের দিনে গিরিশচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে দৃঢ় সমর্থন দান করেন এবং তাঁর গৃহীত ব্যবস্থাকে সঠিক বলে ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয়, 'কোচবিহার বিবাহের বৃত্তান্ত' নামে একখানা সমর্থন-সূচক গ্রন্থ রচনা করে তা প্রচারিত করেন। এই ঘটনা গিরিশচন্দ্রকে কেশবপন্থীদের অন্যতম প্রধান নেতৃপুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠার সুযোগ এনে দেয়। এরপর তিনি নববিধানের কর্মকাণ্ড ও নীতি-নির্ধারণে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকেন।

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের বৈরীতা ও কেশববিরোধী ব্রাহ্মযুবকদের হঠকারিতায় ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মমন্দিরের ছিলো 'প্রাণের ও রক্তের যোগ'। তাই ১৮৮৩ সালে তিনি ময়মনসিংহে গিয়ে অক্লান্ত শ্রমে সেখানকার ব্রহ্মমন্দির পুনর্নির্মাণ ও ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্গঠিত করেন। ১৮৯২ সালে পাঁচদোনায় নিজের বাড়ীতে 'উপাসনা-কুটির' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠানে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় ও অন্যান্য ব্রাহ্ম বন্ধুগণ যোগদান করেন।

কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর নববিধান সমাজ পুনরায় সংকট ও সমস্যায় পড়ে। উচ্চাভিলাষী নেতৃত্বকামী সমাজভুক্ত কিছু ব্যক্তি তাঁদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। গিরিশচন্দ্র এঁদের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারায় কখনো কখনো মন্দিরে উপাসনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এক সময় দরবার থেকে বিতাড়িত হয়ে নিরাশ্রয় হতে হয় তাঁকে। পরে আরো কয়েকজন ব্রাহ্ম বন্ধুর সঙ্গে বিডন স্ট্রীটের কেশব একাডেমী স্কুলগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরপর পটুয়াটোলায় প্রচার কার্যালয়, ছাপাখানা ও ছাত্রনিবাস

স্থাপিত হয়। এখানে সাপ্তাহিক সামাজিক উপাসনা পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপরে বর্তায়। এইভাবে ব্রাহ্মসমাজের চরম ক্রান্তিকালে গিরিশচন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের অনেক উত্থান-পতন ও সংকট-সাফল্যের সাক্ষী ছিলেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক

ব্রাহ্মসমাজের একজন সফল প্রচারক হিসেবেও গিরিশচন্দ্র সেনের নাম স্মরণযোগ্য। প্রয়োজনের অনুরোধেই তাঁকে প্রচারক হতে হয়, নইলে প্রচারক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিলোনা। যখন ময়মনসিংহের ব্রাহ্মবন্ধু গোপীকৃষ্ণ সেনের অকারণ বিরোধিতায় তিনি ব্যথিত, তখন তিনি ময়মনসিংহ ত্যাগ করে কলকাতায় বসবাসের সিদ্ধান্ত জানিয়ে প্রচার ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রকে পত্র লেখেন। গিরিশচন্দ্র বলেছেন :

> আমি প্রচারব্রত গ্রহণ করিতেছি ভাবিয়া তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহ সূচক পত্র লিখেন। কিন্তু তখন আমি প্রচারক হইব এরূপ ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করি নাই। প্রচার ব্রত অতিশয় উচচ ব্রত। সেই গ্রহণের উপযুক্ত আমি আপনাকে কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছিলামনা। তবে বিষয়-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রচারকমণ্ডলীর নিকটে থাকিব এবং তাঁহাদের কোন কোন কার্য্যে সহায়তা করিব, আমার মনে এরূপ সঙ্কল্প হইয়াছিল।[৭৯]

মূলত কেশবচন্দ্র সেনের পরামর্শ ও নির্দেশেই গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ১৭৯৫ শকাব্দের শেষার্দ্ধে বঙ্গপ্রদেশের বাইরে আসামে প্রথম প্রচার আরম্ভ করেন। তখনো তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারক হিসেবে মণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত হননি। তিনি নিম্ন ও মধ্য আসামে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজ শেষে বর্ষার শুরুতে কলিকাতায় ফিরে এলে আচার্য কেশবচন্দ্র সেন 'মিরার' পত্রিকায় এই প্রচারবৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করেন এবং তাঁকে 'প্রচারক' হিসেবে অভিহিত করেন। গিরিশচন্দ্র ১৭৯৬ শকাব্দের ২২ ভাদ্র প্রচারক সভায় যোগ দেন এবং প্রচারক হিসেবে তালিকা-ভুক্ত হন। এরপর প্রায় ৩৫ বছর তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন।

গিরিশচন্দ্র কখনো আচার্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে, কখনো অন্যান্য প্রচারক-দের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে, আবার কখনো বা স্বাধীনভাবে একাকী বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে প্রচারের কাজ করেন। আচার্যের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে প্রথম তিনি 'প্রচারযাত্রায়' যান বর্ধমানে। ১৮৩১ সনের কার্তিক মাসে প্রায় একমাসের জন্য আচার্যের সঙ্গে বিহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া হয়। এই যাত্রায় তাঁর উপরে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকার জন্যে প্রচারবৃত্তান্ত রচনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই পর্যায়ে প্রথমে বঙ্গদেশের হাওড়া, নৈহাটি, চন্দননগর, জগদ্দল পল্লী ও কেশবচন্দ্রের পৈতৃক জন্মভূমি গৌরিভা গ্রামে প্রচার চালানো হয়। পরে মোকামা, রাঢ়ঘাট, মজফ্‌ফরপুর, বাঁকিপুর, গয়া, ডোমরাও, গাজিপুর, আরা ও শোণপুরে প্রচারের কাজ হয়।

কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র দলবদ্ধভাবে ও একাকী বঙ্গদেশ ও তার বাইরের বিভিন্ন প্রদেশের স্থানে প্রচার করেন। তিনি বাংলা, উর্দু ও হিন্দী এই তিন ভাষাতেই বক্তৃতা দিতেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, বাঁকিপুর, ভাগল-পুর, আরা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, লাহেরিয়া সরাই, চাতরা, ঝাঁসি, শিমলা শৈল, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, হায়দরাবাদ সিন্ধ, হায়দরাবাদ নিজাম, পূর্ণিয়া, গাজীপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে তিনি উর্দু ভাষায় বক্তৃতা করেছিলেন। এ-সম্পর্কে বলেছেন তিনি:

> প্রকৃত ধর্ম্ম, নববিধান কি, 'বিশ্বাস কিরূপ বস্তু' জীবনের উন্নতি, প্রত্যাদেশতত্ত্ব, উপাসনাতত্ত্ব, ঈশ্বর অনুপস্থিত নহেন উপস্থিত, স্বর্গ-নরক-তত্ত্ব, একতাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে উর্দু ভাষায় বক্তৃতা হইয়াছিল। অধিকাংশ প্রবন্ধাকারে লিখিয়া সভায় পাঠ করা গিয়াছিল, দুইতিন স্থানে মুখে বলা গিয়াছিল।[৮০]

হিন্দীভাষায় বক্তৃতা-দান বিষয়ে বলেছেন:

> লাহোর, করাচি এবং হায়দরাবাদ সিন্ধের ব্রহ্মমন্দিরে হিন্দীভাষায় উপাসনা ও উপদেশ এবং ডাল্টানগঞ্জ ও পূর্ণিয়ানগরে ছাত্রসভায় হিন্দীতে ক্ষুদ্র বক্তৃতা হইয়াছিল।[৮১]

অনেকক্ষেত্রেই প্রচার-বক্তৃতার সময় সেই অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সভাপতিত্ব করতেন।

প্রচারকাজে কখনো কখনো সংকট-সমস্যা-বিপদেও যে পড়তে হয়েছে তাঁর বিবরণও দিয়েছেন গিরিশচন্দ্র। একবার বনগ্রামের নিকটবর্তী নবফুলী গ্রামে প্রচারশেষে রাত্রিবেলা পথ হারিয়ে তাঁদের মহাসংকটে পড়তে হয়েছিল। তাঁদেরকে ডাকাত বিবেচনায় গ্রামের মানুষ রাত্রিযাপনের আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। শেষপর্যন্ত প্রচণ্ড শীতে অভুক্ত অবস্থায় তাঁদের নদীতীরের উন্মুক্ত মাঠে রাত কাটাতে হয়। গিরিশচন্দ্র স্মৃতিচারণ করেছেন সেই ঘটনার :

> রজনীর শেষভাগে আমি শ্রান্ত ক্লান্ত ও নিদ্রাকৃষ্ট হইয়া একটি বৃহৎ মাটীর ঢেলাকে উপাধানস্বরূপ করিয়া মাঠে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, অন্য কোন কোন বন্ধুও আমার অনুসরণ করিয়াছিলেন।[৮২]

যশোরে গিয়েও তাঁদের তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। যশোর-সফরের বর্ণনা দিতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র বলেছেন :

> তখন সেখানে কোন আত্মীয় পরিচিত ব্রাহ্ম ছিলেন না। জাতি যাইবার ভয়ে তথাকার কোন ভদ্রলোক আমাদিগকে বাসায় স্থান দান করেন নাই, এমন কি হুকো বন্ধ হইবে ভাবিয়া বাসায় ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্গীতাদি করিতে দেন নাই। আমরা ষ্টেশনের নিকটে একটি ক্ষুদ্র মুদিদোকান আশ্রয় করিয়া দুইতিন দিন ছিলাম। মাঠে ও পথে সঙ্গীত বক্তৃতাদি হইয়াছিল। স্কুলগৃহে বক্তৃতা করার চেষ্টা করা গিয়াছিল, অনুমতি পাওয়া যায় নাই।[৮৩]

গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রচারকজীবনে বঙ্গপ্রদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চল এবং আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যভারত. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলের বহু প্রসিদ্ধ নগর ও গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। বহির্ভারতে বার্মাদেশেও তিনি প্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'আত্মজীবনে' তাঁর প্রচারকাজের একটি অসম্পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। প্রচারকজীবনের নানা বৃত্তান্ত তিনি লিখে গেছেন 'ধর্মতত্ত্ব', 'মহিলা', 'পরিচারিকা', 'বামাবোধিনী', 'বঙ্গবন্ধু', 'ঢাকাপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায়।

আচার্য কেশবচন্দ্র ও ভাই গিরিশচন্দ্র

গিরিশচন্দ্রের জীবনে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রেরণা ও প্রভাব বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার পেছনে কেশবচন্দ্রের অবদান স্মরণযোগ্য। গিরিশ-মানস গঠনে কেশবচন্দ্রের শিক্ষা ও সাহচর্যের ভূমিকাও কম নয়। প্রকৃতপক্ষে কেশবচন্দ্র ছিলেন গিরিশের 'বন্ধু, দার্শনিক ও পথ-প্রদর্শক'। উভয়েই ছিলেন প্রায় সমবয়স্ক। প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদার ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি-প্রতিষ্ঠা-সম্মানের ব্যবধান থাকলেও কেবশচন্দ্রের উদারতায় উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠেছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

১৭৮৭ শকাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে কেশবচন্দ্র প্রচার-উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহে আসেন। ইতোপূর্বেই গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। কেশব চন্দ্রের আগমনে ময়মনসিংহে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, তাঁকে দেখার জন্যে দর্শনার্থীদের ভীড় হয়। গিরিশচন্দ্রও প্রায় দুইবেলা যেতেন। এখানেই তিনি কেশবচন্দ্রকে প্রথম দর্শন করেন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়। কেশবচন্দ্র ফিরে যাওয়ার সময় নৌকায় বিছানা-বালিশ না থাকায় গিরিশচন্দ্র আচার্যের জন্যে তাঁর বিছানা-বালিশ দিয়ে দেন। কিন্তু জাত যাওয়ার ভয়ে তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে পংক্তিভোজনে রাজি হননি। তখনো গিরিশচন্দ্র সর্বসংস্কারমুক্ত হতে পারেননি।

এরপর তিনি যখন ১৮৭৫ সালে ময়মনসিংহ ত্যাগ করে কলকাতায় ভারতাশ্রমে বসবাস আরম্ভ করেন তখন কেবশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করেন। এইসময় তিনি আচার্যের দৈনিক উপাসনায় যোগ দিতে থাকেন এবং তাঁর নির্দেশে ভারতাশ্রমের স্ত্রীবিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তিনি প্রচারে বঙ্গপ্রদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। কেশবচন্দ্র ব্যক্তিগত সফরেও গিরিশচন্দ্রকে কখনো কখনো সঙ্গে নিয়েছেন। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কেশবচন্দ্র যখন সপরিবারে গাজীপুরে যান তখনো গিরিশচন্দ্র সঙ্গী হয়েছিলেন। গাজীপুরের সফরে আচার্যের নিকট সান্নিধ্য অর্জন গিরিশচন্দ্রের জীবনের পরম মূল্যবান স্মৃতি-সম্পদ। আচার্য সম্পর্কে অনেক ঘরোয়া কথা তিনি এই সফর-প্রসঙ্গে বলে গেছেন। এ-রকম একটি ঘটনার কথা বলেছেন তিনি:

আচার্য্য একদিন সায়ংকালে পারেজীর উদ্যানে তরুতলে ধ্যানস্থ হইয়াছেন, এমন সময় একটি কলকণ্ঠ বিহঙ্গ সুললিত স্বরে গান করিয়া তাঁহাকে

মুগ্ধ করে, তাহাতে তিনি স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ হন। সেইবার মাঘোৎসবে "গাজীপুরের পাখী" বিষয়ে মধুর উপদেশ হইয়াছিল। তদবধি সুকণ্ঠ পক্ষীর প্রতি আচার্য্যের হৃদয় অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল, তিনি কতকগুলি সুললিতকণ্ঠ সুশ্রী ক্ষুদ্র পক্ষী পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া যত্নপূর্ব্বক গৃহে পালন করিতেছিলেন। একদিন তিনি স্থানান্তরে ছিলেন, ভৃত্যের অবহেলায় আহার না পাইয়া কতক পাখী মরিয়া যায়, তাহাতে তাঁহার মনে বড় ক্লেশ হয়। তখন হইতে তিনি পক্ষিপালনে বিরত হন।[৮৪]

গিরিশচন্দ্রের নিষ্ঠা ও ক্ষমতা সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের প্রগাঢ় আস্থা ও বিশ্বাস ছিলো। তাই তাঁকে তিনি বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে চাইতেন। গিরিশচন্দ্র বলেছেন:

নববিধান ঘোষণার পর বিধানাচার্য্য একদিন শ্রীদরবারে এক একজন প্রচারককে এক একটী বিশেষ কার্য্য ও ভাব দ্বারা চিহ্নিত করেন। মোহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা এবং সেই শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ ও তাহা অনুবাদপূর্ব্বক প্রচার করা আমার কার্য্য, এবং সত্যানুরাগ আমার ভাব নির্দিষ্ট হয়।[৮৫]

'বিধানাচার্য্যের শুভদৃষ্টি' লাভে ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র। আচার্য ব্রহ্মমন্দিরের বেদী থেকে গিরিশচন্দ্রকে 'মোহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক' বলে ঘোষণা করেন।

একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন: কমল সরোবরে জল-সংস্কারের দিন ব্রহ্মানন্দ স্বহস্তে আমার মস্তকে তৈলার্পণ করিয়া বলিলেন, "আমি মহাপুরুষ মোহম্মদের অঙ্গে তৈল ম্রক্ষণ করিতেছি।"[৮৬]

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় গিরিশচন্দ্রকে আচার্য কতোখানি গুরুত্ব ও মূল্য দিতেন। কেশবচন্দ্র কিছুকাল গিরিশচন্দ্রের কাছে দীওয়ান-ই হাফিজের পাঠ গ্রহণ করেন,—এটিও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

তাঁর প্রতি আচার্যের মনোযোগ, প্রীতি ও অনুরাগের দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন:

কমলকুটীরে নাট্যমঞ্চে নববৃন্দাবন নাটকের অভিনয়ে পৃথিবীর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সম্মিলনসূচক tableau (দৃশ্যাভিনয়) হইয়াছিল। তখন কেহ

বৈষ্ণব, কেহ শাক্ত, কোন বন্ধু, কোন বন্ধু খৃষ্টবাদী, কেহ বা বৌদ্ধ, কেহ বা শিখ সাজিয়া এক শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। আমাকে ইজারচাপকান পরিধান ও মস্তকে টুপি ধারণ এবং মুখমণ্ডলে কৃত্রিম শ্মশ্রুর সংযোজন করিয়া মৌলবী সাজিয়া উপরিউক্ত সকল মৌন অভিনেতার সঙ্গে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। তদ্দর্শনে আচার্য্য ঈষৎ হাস্য করিয়া অগ্রসর হইয়া সেলাম করিয়াছিলেন। আমার সেই সাজ তাঁহার যে মনোমত হইয়াছিল, এরূপ বোঝা গিয়াছিল। এই প্রকার উৎসাহদানে তিনি যেন গর্দ্দভ পিটিয়া আমাকে মানুষ করিয়াছেন।[৮৭]

কেশবচন্দ্র ইসলামী শাস্ত্র চর্চায় গিরিশচন্দ্রকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেন। কোরআন শরীফের দুই-তিন খণ্ড বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হলে তিনি খুবই আনন্দিত হন। কেউ এই অনুবাদের ভাষা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলে তিনি তার প্রতিবাদ করতেন। তিনি যখন শেখ সাদী 'বোস্তানে'র কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ আচার্যকে উপহার দেন তখন তিনি আনন্দিত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে এই উপহার লাভ করে তিনি চরিতার্থ হয়েছেন এবং এইরকম উপহারই তিনি বরাবর প্রত্যাশা করেন। গিরিশচন্দ্র যখন সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ অনুবাদ করেন তখন আচার্য আর ইহলোকে নেই। আফ্‌সোস করে তিনি অনুবাদকের বক্তব্যে বলেছিলেন :

> আজ কোরআনের অনুবাদ সমাপ্ত দেখিয়া আমার মনে যুগপৎ হর্ষ-বিষাদ উপস্থিত। হর্ষ এই যে, এতকালের পরিশ্রম সার্থক হইল। বিষাদ এই যে, ইহার প্রথমাংশ শ্রীমদাচার্য কেশবচন্দ্র সেনের করকমলে অর্পণ করিয়াছিলাম; তিনি তাহা পাইয়া পরমাহ্লাদিত হইয়াছিলেন ও তাহার সমাপ্তি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; শেষাংশ আর তাহার চক্ষুর গোচর করিতে পারিলাম না; ঈশ্বর তাঁহাকে আমাদের চক্ষুর অগোচর করিলেন। তিনি এই অনুবাদের এরূপ পক্ষপাতী ছিলেন যে, তাহার নিন্দা কেহ করিলে সহ্য করিতে পারিতেন না। আজ অনুবাদ সমাপ্ত দেখিলে তাঁহার কত না আহ্লাদ হইত, দাসও তাঁহার কত আশীর্বাদ লাভ করিত।[৮৮]

কুচবিহার-বিবাহকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং ফলশ্রুতিতে ব্রাহ্মসমাজ পুনরায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। কেশবচন্দ্রের অনুরাগী অনুসারী, সুহৃদদের অধিকাংশই তাঁকে ত্যাগ করেন। কেশবচন্দ্র খুবই

বিপন্ন ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। মুষ্টিমেয় যে-কয়জন নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্ম কেশব-চন্দ্রকে সমর্থন জানান গিরিশচন্দ্র তার অন্যতম।

গিরিশচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে কেবল মৌখিক সমর্থন বা সহানুভূতি জানাননি, তিনি তাঁর ভক্তি ও বিশ্বাস দিয়ে প্রকৃত ধার্মিকের মতো অনুভব করেছেন আচার্যের সিদ্ধান্ত ও কর্মের যথার্থতা। তিনি 'কোচবিহার বিবাহের বৃত্তান্ত' নামে একটি পুস্তক রচনা করে কেশবচন্দ্রের কাজের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পান। তিনি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন আচার্যের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও বিষোদগার। জানিয়েছেন:

> কুচবিহার-বিহাহ আচার্য্যের প্রতি বিরোধীদের বিরূপভাব ও শত্রুতা-চরণের বিশেষ বিকাশপ্রাপ্তির সুযোগ বিধান করিয়াছিল। কুচবিহার-বিবাহের বহু বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্যের বিরুদ্ধে বিষাদানল প্রধূমিত হইতেছিল। সেইসময় প্রজ্জ্বলিত হইয়া প্রকাশ পাইবার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। আচার্য্যের নিকটে ধর্ম্মগ্রহণ ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহার এরূপ কতিপয় অনুগামী নিজেদের স্বার্থসাধনে বাধা পাইয়া তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে লোকের নিকট অবিশ্বস্ত, অশ্রদ্ধেয় এবং অপদস্থ করিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র দীল বদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করেন, পত্রিকাবিশেষ প্রচার করিয়া তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনাদির বিরুদ্ধে নানা কথা ঘোষণা করিতে থাকেন, এবং অন্যান্য উপায়ে তাঁহার ও তাঁহার অনুগত বিশ্বাসীদলের অপবাদ রচনা করেন।[৮৯]

গিরিশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন বিরুদ্ধবাদীদের কেশব-বিদ্বেষ প্রচারের একটা অজুহাত ও উপলক্ষ হয়েছিল এই কুচবিহার-বিবাহ।

কুচবিহার-বিবাহকে উপলক্ষ করে যখন ব্রাহ্মসমাজে বাদ-প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, তখন গিরিশচন্দ্র কেশবচন্দ্রের একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করেন কিছুদিন। এই বিবাহ সম্পর্কে যেসব প্রতিবাদপত্র আচার্য-সমীপে প্রেরিত হতো তা পড়ার এবং তা থেকে নির্বাচিত পত্রাবলী আচার্যের কাছে পেশ করার দায়িত্ব ছিলো তাঁর। সেই বিপন্ন মুহূর্তে গিরিশচন্দ্র গভীর প্রত্যয় ও প্রবল ভক্তি নিয়ে আচার্যের পাশে এসে দাঁড়ান।

গিরিশচন্দ্র সবচেয়ে বেশি বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭—১৯০৫) ভূমিকায়। ভিন্নমতাবলম্বী কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধবাদীদের তিনি উদার প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দানে নিরুৎসাহিত হননি। গিরিশচন্দ্র কিছুটা বেদনা ও ক্ষোভ মিশেয়ে বলেছেন:

> সমধিক বিস্ময় ও আশ্চার্যের বিষয় এই যে, যখন যে লোক কেশবচন্দ্রের প্রাণের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, আমাদের ধর্ম্মপিতা মহর্ষিদেব তাঁহাদের সহায় ও মুরুব্বি হইয়াছেন, তাহাদিগকে বুকে তুলিয়া লইয়াছেন, অর্থাদিদানে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার মত ও বিশ্বাসে মিলুক বা না মিলুক তাঁহারা তাঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। এই নূতন বিরোধীদলের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ও আদর পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। অথচ তাঁহার মত ও ভাবের এবং তাঁহা কর্ত্তৃক প্রচারিত প্রণালী ইত্যাদির অনুবর্ত্তী নহেন। তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার বিপক্ষ হইয়াও এক সময়ে কেশবচন্দ্রের বিপক্ষ স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রদাতাদিগকে বিশেষ উৎসাহ দান করিয়াছেন। উক্ত ঋষিধর্ম্ম যোগধ্যানের সঙ্গে এইরূপ ভাবের কি প্রকার সামঞ্জস্য আছে, আমরা বুঝিয়ে উঠিতে পারিনা। অনেকে বলেন মহাপ্রতিভাশালী সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী উদারচেতা উন্নতিশীল কেশবচন্দ্রের প্রভাবে তাঁহার রক্ষণশীল সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মমত এদেশে গৃহীত ও সমাদৃত হইল না, তজ্জন্য মহর্ষি কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে এতদূর প্রতিকূল ছিলেন।[১০]

কেশবচন্দ্রের প্রতি গিরিশচন্দ্রের শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিলো অপরিসীম। কেশবচন্দ্রের বিরোধিতা ও সমালোচনা করার জন্যে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। তাঁদের পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন। কৃতজ্ঞ অনুরাগী ও বিশ্বাসী ভক্তের দৃষ্টি থেকে আচার্যের মূল্যায়ন করে তিনি বলেছেন:

> কেশবচন্দ্র আমাদের পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা সমধিক ভক্তির পাত্র, তাঁহার নিকটে আমরা আধ্যাত্মিক অশেষ ঋণে ঋণী ...।[১১]

কেশবচন্দ্র ও নববিধানের আদর্শের সার্থক অনুশীলনও গিরিশচন্দ্রের জীবনে হয়েছিল বলে তাঁর মৃত্যুর পর 'নব্যভারত' পত্রিকার এক প্রতিবেদনে

উল্লেখ করা হয়:

> কেশবচন্দ্র অনেক তপস্যা করিয়া, ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের ন্যায়, নববিধানকে এই দেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু নববিধান ব্যর্থ হইত, যদি কোন জীবনে উহা অনুশীলিত বা প্রতিফলিত না হইত। নববিধান ব্যাপ্ত, জমিত, সঞ্চিত, অনুশীলিত, প্রতিফলিত, অনুরঞ্জিত, অনুপ্রাণিত ও সম্যক আচরিত প্রতাপচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্রে এবং আরো কাহারও কাহারও জীবনে।... নববিধান উপেক্ষিত ও উপহাসিত হইতে পারিত, যদি প্রতাপচন্দ্র বা গিরিশচন্দ্রের এবং আরো কতিপয় মহাপুরুষের এদেশে অভ্যুদয় না হইত। কেশবচন্দ্রের ভক্তি অনুরঞ্জিত যাঁহাদের জীবনে, তাঁহাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র অন্যতর। বলিতে সঙ্কোচ কি যে, কেশবজীবন এবং নববিধান সার্থক হইয়াছে।[১২]

কেশব-ভক্তদের মধ্যে বোধকরি ভাই গিরিশচন্দ্রের কর্ম-সাফল্যেই আচার্যের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা সবচাইতে বেশী পূরণ হয়েছে।

সমকালীন প্রতিক্রিয়া

ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়ার পর প্রথম পর্যায়ে তীব্র পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয় গিরিশচন্দ্রকে। সনাতন হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী আত্মীয়স্বজন তাঁকে পুনরায় পিতৃধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্যে সচেষ্ট হন। হিন্দুসমাজ নানা উৎপীড়ন-অত্যাচার আরম্ভ করে। বাসাভাড়া কিংবা পরিচারক পাওয়া বা আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর জন্যে নার্স বা দাই পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। হিন্দুসমাজের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার ভয়ে গিরিশচন্দ্রের ব্রাহ্ম-বন্ধুরাও তাঁর সান্নিধ্য বাঁচিয়ে চলতেন, তাঁকে 'পরিত্যক্ত' হয়ে একরকম 'একঘরে' অবস্থায় থাকতে হয় ময়মনসিংহে বাসকালীন সময়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কুচবিহার-বিবাহ সমর্থন করায় বিবাহবিরোধীরা তাঁকে ব্রাহ্মসমাজ থেকে বহিষ্কার ও 'পতিত' ঘোষণা করেন। কেশবচন্দ্র সেনকে সমর্থন করার কারণে তাঁকে নিন্দিত ও সমালোচিত হতে হয়। কেশবচন্দ্রের অনুসারী হিসেবে তিনিও প্রবল সামাজিক প্রতিক্রিয়ার শিকার হন।

নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ধর্মসমন্বয় উদ্দেশ্য প্রতিপালনের জন্যে আচার্য কেশবচন্দ্রের নির্দেশে গিরিশচন্দ্র ইসলামীশাস্ত্র-চর্চায় নিয়োজিত হন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় মূল আরবী-ফারসী ভাষা থেকে ইসলাম ধর্মের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রগ্রন্থই বাংলায় অনুবাদ করেন এবং এইসব শাস্ত্রগ্রন্থের তিনিই ছিলেন প্রথম বঙ্গানুবাদক। হিন্দু ও মুসলমানসমাজে তাঁর এই অসামান্য কাজের পক্ষে-বিপক্ষে দুইরকম প্রতিক্রিয়াই হয়। মুসলমান সমাজে তিনি একই সঙ্গে নন্দিত ও নিন্দিত হন। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাঁর এই কাজকে অনুমোদন না করলেও, প্রগতিশীল উদার হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে অভি-নন্দিত করেন।

ইসলামীশাস্ত্র-চর্চার প্রস্তুতি যখন তিনি গ্রহণ করেছেন, তখন ইসলাম-ধর্মীয় গ্রন্থ সংগ্রহের সমস্যা ও মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়াও কম ছিলোনা। তিনি ঢাকানিবাসী তাঁর এক মুসলমান ব্রাহ্ম-বন্ধু জালালউদ্দীনের সহায়তায়

একখণ্ড কোরআন শরিফ সংগ্রহ করেন। হাদীস শরীফ ক্রয়ের কাহিনী বলেছেন তিনি :

> একসময়ে আমি দোকানে একখানা হাদিস গ্রন্থ ক্রয় করিতে গিয়াছিলাম। মোসলমান বিক্রেতা দূর হইতে কেতাবখানা প্রদর্শন করিয়াছিলেন মাত্র, আমাকে তাহা স্পর্শ করিতে দেন নাই। আমি আমাদের দপ্তরীযোগে উহা খরিদ করিয়া আনয়ন করি . . .।[২৩]

গিরিশচন্দ্র ইসলামী শাস্ত্রের অনেকগুলো ধ্রুপদী গ্রন্থ অনুবাদ করলেও কোরআন শরীফ অনুবাদের কারণেই তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। কোরআন শরীফের বঙ্গানুবাদ অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় অধিক প্রচারিত হয়েছিল। তাই সমকালীন প্রতিক্রিয়ার সিংহভাগই এই মহাগ্রন্থের অনুবাদকে কেন্দ্র করে দেখা দেয়। পূর্বেই বলা হয়েছে মুসলমান সমাজে এর বিবিধ প্রতিক্রিয়াই হয়েছিল।

কোরআন শরীফের অনুবাদ কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলমান-সমাজের পক্ষ থেকে অনুবাদককে (বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় তখনো গ্রন্থে অনুবাদকের নাম মুদ্রিত হয়নি) বিশেষ প্রশংসা ও অভিনন্দন জানানো হয়। ১৮৮২ সালের ২ মার্চ কলকাতার আহমদউল্লাহ এবং কলকাতা মাদ্রাসার 'ভূতপূর্ব উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃত্তিধারী' আবদুল আলা ও আবদুল আজিজ অনুবাদকের কাছে ইংরেজীতে লেখা একটি প্রশংসাপূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন। তাঁরা তাঁদের অভিমত জানিয়ে বলেন :

TO THE AUTHOR OF THE BENGALI TRANSLATiON OF THE QURAN, CALCUTTA.

REVD. SIR,

We the undersigned have most carefully and attentively read and compared with the original the first two parts of your valuable production, viz, the Bengali translation of the Quran' and our curiosity is not less excited to find it to be such a faithful and literal translation from a classic language as the Arabic—which varies so widely in its construction from all other languages of the world.

As we are Mohamedans by faith and birth, our best and hearty thanks are due to the author for his disinterested and patriotic effort and the great troubles he has taken to diffuse deep meaning of our Holy and Sacred religious book, the Quran, to the public.

The version of the Quran above quoted has been such a wonderful success that we would wish the author would publish his name to the public, to whom he has done such a valuable service, and thus gain a personal regard from the public.

Lastly in our humble and poor opinion we think that the book may be very useful, particularly to the Mohamedans, if the style could be rendered a little easier so as to be understood by the less erudite.

We have the honour to be,
REVD. SIR,
Your most obedient servants
AHMUD ULLAH,
Late Arabic Senior scholar of the Calcutta Madrashah,
ABDUL ALA,
ABDUL AZIZ. ৯৪

CALCUTTA,
The 2nd. March, 1882.

ঢাকা থেকে আলিমুদ্দীন আহমদ ১২৮৮ সালের ১০ ফাল্গুন ফারসী ভাষায় লিখিত এক পত্রে কোরআনের অনুবাদের প্রশংসা করেন। ৬ ফাল্গুন ১২৮৮ সালে আবুয়ল মজফর আবদুল্লাহ এক পত্রে অনুবাদককে জানান :

মহাশয়ের বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত কোরআন শরীফ দুই খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়া অতি আহলাদের সহিত পাঠ করিলাম। এই অনুবাদ আমার বিবেচনায় অতি উত্তম ও শুদ্ধরূপে টীকাসহ হইয়াছে। আপনি তফসীর হোসেনী ও শাহ আবদোল কাদেরের তফসীর অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত টীকা লিখিয়াছেন এ জনের ক্ষুদ্র বিদ্যা-বুদ্ধিতে পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বোধকরি যে, এ পর্য্যন্ত কোরআন শরীফের অবিকল অনুবাদ অন্য কোন ভাষাতেই এরূপ হয় নাই, এবং আমি

মনের আহ্লাদের সহিত ব্যক্ত করিতেছি যে, আপনি যে ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে যারপর নাই পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই অনুবাদ করিয়াছেন, ইহার ফলে ঈশ্বর আপনাকে ইহ ও পরকালে প্রদান করুন।[২৫]

যশোরের কাজীপুর থেকে মৌলবী আফতারউদ্দীন অনুপ্রেরণামূলক এক পত্রে মন্তব্য করেন:

আমরা আপনার ১ম ভাগ কোরআন প্রাপ্তান্তে পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম।...এই পুস্তকের বাঙ্গলা অনুবাদ অতি উৎকৃষ্ট ও প্রাঞ্জল এবং ইহা যে একটি উপাদেয় পদার্থ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। ফল কথা, পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইলে কেবল অনুবাদকের নয় দেশের বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির গৌরব বাড়িবে সন্দেহ নাই।[২৬]

কোরআনের বঙ্গানুবাদ সম্পর্কে আরো অনেকে তাঁদের অভিমত ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তাঁদের এই দৃষ্টি আকর্ষণ অনুবাদককে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেন। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন:

আরও অনেক মৌলবী নিজ হইতে প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠাইয়াছেন, এবং অনেক মোসলমান বন্ধু অনুবাদিত কোরাণাদি পুস্তক যাহাতে বঙ্গীয় মোসলমান সমাজে বাহুল্যরূপ প্রচার ও বিক্রয় এবং বিশেষ আদৃত হয় তজ্জন্য চেষ্টাবত্ন করিতেছেন। আমি তাঁহাদের নিকটে বিশেষরূপে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।[২৭]

কোরআন শরীফের প্রথম বঙ্গানুবাদক ও অন্যান্য ইসলামী শাস্ত্রের চর্চাকার হিসেবে গিরিশচন্দ্র বিশেষভাবে মুসলমান সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাঁর দৃষ্টান্ত বাঙালী মুসলমানকে বাঙলায় ইসলামীশাস্ত্রের চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তিনি বাঙালী মুসলমানের মনে বিশেষ প্রেরণা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রের জীবিতকালেই মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে তাঁর জীবনী রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কার্তিক অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ সালে 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকায় বিশিষ্ট ধর্ম-প্রচারক পাদ্রী মওলানা মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন (১৮৭০—১৯৩৭) 'শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী' নামে পরিচিতিমূলক

একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জমিরুদ্দীন গিরিশচন্দ্রের জীবনী আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে বলেছেন:

> "ইসলাম প্রচারকের" পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন যে, ইসলামী কাগজে ব্রাহ্মের জীবনী কেন? বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের ইতিহাসের সহিত গিরীশবাবুর জীবনীর বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, আজ ইসলাম প্রচারকে তাঁহার জীবনীর প্রচার হইল। বঙ্গদেশে খ্রীস্টান মিশনারীরা অনেকদিন হইতে তাঁহাদিগের ধর্ম্মপ্রচার করিয়া আসিতেছিলেন ও কত শত মুসলমান যুবককে খৃষ্টানীর দিকে টানিতেছিলেন' কিন্তু যে দিন বঙ্গীয় মুসলমান যুবক গিরিশবাবুর "বঙ্গানুবাদিত কোরাণ শরিফ" ও "হজরতের জীবনী" হস্তে পাইয়াছেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার স্বধর্ম্মের দিকে টান পড়িয়াছে। আর খৃষ্টান, হিন্দু ও ব্রাহ্ম ইসলামের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছেন।[২৮]

জমিরুদ্দীন মন্তব্য করেছেন, "বঙ্গদেশে লক্ষাধিক মৌলবী থাকতে আমাদের জাতীয় গ্রন্থাবলী গিরীশবাবুর পূর্ব্বে কেহ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।" আফ্‌সোস করে তিনি আরো বলেছেন, "আমাদের মৌলবী সাহেবগণ কেবল 'ছায়ের' করিয়া ফকির হইতেছেন।..."

'ইসলাম-প্রচারক'-সম্পাদক এই প্রবন্ধের শেষে পাদটীকায় গিরিশচন্দ্রের জীবনী প্রকাশের কৈফিয়ৎ প্রসঙ্গে বলেছেন:

> অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, মুসলমানের ধর্ম্মবিষয়ক পত্রিকায় একজন ব্রাহ্মের জীবনচরিত কেন স্থান পাইল? তদুত্তরে আমরা বলি যে, গিরীশবাবুর অসীম অধ্যবসায়, জ্বলন্ত উৎসাহ, উদ্দীপ্ত ধর্ম্মানুরাগ ও অমানুষিক ত্যাগ স্বীকারের বিষয় মুসলমানদিগকে দেখাইয়া, তাঁহাদিগকেও এইসকল সদগুণে বিভূষিত হইবার জন্য উত্তেজিত করণার্থে, তদীয় সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এস্থলে সন্নিবিষ্ট হইল।[২৯]

গিরিশচন্দ্র বাঙালী মুসলমান সমাজে যে কী আন্তরিকভাবে গৃহীত হয়েছিলেন তার প্রমাণ মেলে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের দৃষ্টান্তে।

তিনি বলেছেন :

মোসলমানদের প্রতিভাশালিনী বিদূষী কন্যা মতিচূর পুস্তকের রচয়িত্রী শ্রীমতী আর, এস, হোসেন মৎকর্ত্তৃক অনুবাদিত ধর্ম্মসাধন নীতিপুস্তকের সমালোচনায় আমাকে "মোসলমান ব্রাহ্ম" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আকৃতি প্রকৃতি ভোজ্য পরিচ্ছেদ আচার ব্যবহারাদি দেখিয়া আমাকে মোসলমান ব্রাহ্ম বলেন নাই, আমি মোসলমান জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া থাকি তজ্জন্য সেরূপ বলিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত। তাঁহার সঙ্গে আমার মাতৃপুত্র সম্বন্ধ স্থাপিত। সেই মনস্বিনী মহিলা উক্ত ঘনিষ্ঠতার পরিচয় নিজেই প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি আমাকে পত্রাদি লিখিতে পত্রে নিজের নাম না লিখিয়া নামের পরিবর্ত্তে "মা" "আপনার স্নেহের মা" বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া থাকেন।[১০০]

'মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) গিরিশচন্দ্রের অনুবাদিত কোরআন শরীফের চতুর্থ সংস্করণের (কলিকাতা, ১৯৩৬) ভূমিকায় বলেছেন :

তিনকোটি মোসলমানের মাতৃভাষা যে বাংলা তাহাতে কোরআনের অনুবাদ প্রকাশের কল্পনা ১৮৭৬ খৃঃ পর্যন্ত এদেশের কোন মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তখন আরবী-পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত মোছলমানের অভাব বাংলাদেশে ছিলনা। তাঁহাদের মধ্যকার কাহারও কাহারও যে বাংলা সাহিত্যের উপরও যথেষ্ট অধিকার ছিল, তাঁহাদের রচিত বা অনুবাদিত বিভিন্ন পুস্তক হইতে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এদিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ তাঁহাদের একজনেরও ঘটিয়া উঠে নাই। এই গুরু কর্তব্যভার বহন করার জন্য সুদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়া, সর্বপ্রথমে প্রস্তুত হইলেন বাংলার একজন হিন্দুসন্তান, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন—বিধান আচার্য কেশবচন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে। গিরিশচন্দ্রের এই অসাধারণ সাধনা ও অনুপম সিদ্ধিকে জগতের অষ্টম আশ্চর্য বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।[১০১]

অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) তাঁর স্মৃতিচারণায় গিরিশচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন :

"মৌলভী গিরীশ সেনের লেখার সঙ্গেও এইসময় আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। রাজসিংহ, পলাশীর যুদ্ধ প্রভৃতি বই পড়ার পর গিরীশ সেনের

তাপসমালা পড়ে মুগ্ধচিত্তে ভাবলাম, 'তা'হলে আমাদের ভাল জিনিসের কদর করার লোকও অন্য সমাজে আছে। এই উদার ধার্মিক বিদ্বানের প্রভাব নিঃসন্দেহ রকমে আমার উপর পড়েছিল। পরে তাঁর কুরআনের বঙ্গানুবাদ পড়ি। বাংলা ভাষায় তিনিই সকলের আগে ঐ অনুবাদ করেন। ধর্মজিজ্ঞাসা ছিল তাঁর অন্তরের অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা। সেই পরম জিজ্ঞাসার মহান তাকীদে তিনি একান্ত যত্নে, একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ইছলাম সম্বন্ধে অধ্যয়ন ও আলোচনা করেন। কুরআন শরীফ ছাড়া তিনি মেশকাত শরীফের বঙ্গানুবাদ (৪র্থ খণ্ড), হযরত মুহম্মদ (দঃ), হযরত ইব্রাহীম, হযরত মুছা, হযরত দাউদ এঁদের জীবন-চরিত্র, দেওয়ান হাফিজের বঙ্গানুবাদ, চারজন ধর্ম্মনেতা প্রভৃতি পঁচিশখানা বই রচনা করেন। আজ পর্যন্ত বাংলার কোন মুছলিম লেখকও অতগুলি বিষয়ে অতগুলি বই লিখেছেন বলে আমার জানা নাই।"[১০২]

গিরিশচন্দ্রের কোরআন শরীফের বঙ্গানুবাদ ও ইসলামী শাস্ত্র-চর্চার ফলে বাঙালী মুসলমান সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও কম হয়নি। গিরিশচন্দ্র নিজেই জানিয়েছেন:

...কোরাণের অনুবাদ খণ্ডশঃ কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হইলে পর মোসলমান বন্ধুদিগের মধ্যে একজন বন্ধু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ একজন কাফের করিয়াছে, তাহাকে পাইলে তাহার শিরশ্ছেদন করিব।"[১০৩]

মধু মিয়া প্রণীত 'শান্তি-কর্ত্তা বা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নামক নবী-জীবনীর 'ভূমিকা'য় লেখক নাম উল্লেখ না করে গিরিশচন্দ্র-প্রণীত নবীজীবন সমালোচনা করে বলেছেন:

বাঙ্গলা দেশে হিন্দু অপেক্ষা মোসলমানের সংখ্যা অল্প না হইলেও বিদ্যাশিক্ষায় ও সাহিত্যালোচনায় বহু পশ্চাতে পতিত বলিয়া আমাদিগের মহাপুরুষ, যুগপ্রবর্তক হযরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রথম জীবনী রচয়িতা —একজন হিন্দু বাঙ্গালী। তিনি আমাদের ধর্ম্মবৃত্তান্ত অনবগত বলিয়াই, তদ্‌রচিত হযরত চরিতে আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার কোন কিছুই নাই।[১০৪]

অবশ্য মধু মিয়া এই নবীজীবনী রচনায় গিরিশচন্দ্র সেনের 'মহাপুরুষ চরিত' (২য় ভাগ) থেকে যে সাহায্য নিয়েছেন 'ভূমিকা'য় তা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি।

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর ২য় বর্ষের 'আহলে হাদীস' পত্রিকায় মওলানা মুহম্মদ ইসরাইল রচিত 'গিরীশবাবুর বঙ্গানুবাদে ভ্রম' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকার বলেন:

> মৃত গিরীশবাবু কর্তৃক অনুবাদিত এক খণ্ড বঙ্গানুবাদ প্রাপ্ত ও আনন্দিত হইয়া মনে মনে বলিলাম, অহো। ইহা কি এক অভিনব সম্পদ ও স্বর্গীয় অবদান পাইলাম। অনুবাদক মহাশয় একজন অমুসলমান হইয়া যে এই বৃহৎ কার্য করিয়াছেন তাহাতে বাংলার মুসলিম সমাজ চিরকালের তরে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। কিন্তু আক্ষেপের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, গ্রন্থখানির কতিপয় পৃষ্ঠা পাঠান্তে আমার ভক্তিও শ্রদ্ধা অভক্তি ও ঘৃণার সঙ্গে পরিবর্তিত হইল। তিনি একস্থানে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়তম নবী (স:) সম্বন্ধে একরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন যাহা তাঁহার সম্মানের হানিজনক হয়। অন্যত্র স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল (আ:) ও শয়তানের আকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বও তিনি অস্বীকার ও অমান্য করিয়াছেন। অনেক স্থানে অনুবাদে ভুল-ভ্রান্তিও করিয়াছেন।[১০৫]

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'নব্যভারত' পত্রিকা তাঁর অবদানের সুগভীর তাৎপর্যের দিকে ইঙ্গিত করে যে মন্তব্য করেছিল তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

> যে দেশ মুসলমানদিগকে চিরকাল ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, সেই দেশে অমর মুসলমান সাধুদিগের গুণকীর্তন করিয়া, ভারতের হিন্দুজাতির মুসলমান-বিদ্বেষ উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।[১০৬]

গিরিশচন্দ্রের উইল

উইলপত্র

"লিখিতং শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন ওলদে স্বর্গগত মাধবরাম সেন, সাকিন পাঁচদোনা পরগণা মহেশ্বরদি থানা রূপগঞ্জ মহকুমা নারায়ণগঞ্জ জিলা ঢাকা, কস্য উইল পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে।

"যেহেতু আমি বার্দ্ধক্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি, জীবনের স্থিরতা নাই। অতএব আমার পৈতৃক ভূসম্পত্তি ও ঘর বাড়ী ইত্যাদি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যে যৎকিঞ্চিৎ আমার স্বত্বাধিকারে আছে, এবং জীবদ্দশা পর্য্যন্ত থাকিবে, তৎ সমুদায়ের সম্বন্ধে ও মৎপ্রণীত পুস্তক সকলের বিষয়ে একটি উইল করা আবশ্যক হইয়াছে।

"ইতিপূর্ব্বে আমি আমার পৈতৃক সম্পত্তিবিষয়ে এক উইল করিয়া ঢাকা জিলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ সবরেজেষ্টরী আফিসে রেজেষ্টরী করাইয়াছিলাম, তাহার অনেক অংশ এক্ষণ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধে সেই উইলপত্র সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়া এই উইল করিতেছি।

"আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা নাই, একান্নভুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রগণ উত্তরাধিকারিরূপে বিদ্যমান। আমার প্রাণ-বিয়োগের পর আমার পরিত্যক্ত পৈতৃক স্থাবর অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ আমার স্বর্গগত সর্ব্বাগ্রজ ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্রগণ শ্রীমান বিপিনচন্দ্র সেন, শ্রীমান সতীশচন্দ্র সেন ও শ্রীমান রমেশচন্দ্র সেন এবং শ্রীমান সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন তুল্যাংশে পাইয়া দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইয়া পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিতে পারিবে। উক্ত সম্পত্তির অপর এক তৃতীয়াংশ আমার স্বর্গগত অগ্রজ হরচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান ইন্দুভূষণ সেন প্রাপ্ত হইয়া দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইয়া উপরি উক্তরূপে ভোগ দখল করিবে।

"আমার স্বকৃত কতকগুলি পুস্তক নববিধানপ্রচারকার্য্যালয়ের অন্তর্গত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত আছে। যথা;—(১) কোরাণের বঙ্গানুবাদ,

(২) মহাপুরুষ এব্রাহিমের জীবনচরিত, (৩) মহাপুরুষ মুসার জীবনচরিত, (৪) মহাপুরুষ দাউদের জীবনচরিত, (৫) মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবনচরিত তিন ভাগ, (৬) হদিস মেস্কাতোল মসাবিহের বঙ্গানুবাদ চারিখণ্ড, (৭) হিতোপাখ্যানমালা প্রথম ভাগ (৮) হিতোপাখ্যানমালা দ্বিতীয় ভাগ, (৯) নীতিমালা প্রথম ভাগ, (১০) তত্ত্বরত্নমালা, (১১) তত্ত্বসন্দর্ভমালা প্রথম ভাগ, (১২) চারিজন ধর্ম্মনেতা। এইসকল পুস্তকের চারিভাগের তিন ভাগ, উপস্বত্ব আমার জন্মভূমি পাঁচদোনা গ্রামের নিম্নলিখিত জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। উক্ত পুস্তক সকল কলিকাতাস্থ নববিধান প্রচারকার্য্যলয়ের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইয়া বিক্রয় হইতে থাকিবে। প্রচারকার্য্যালয়ের উক্ত অধ্যক্ষ এ বিষয়ে য়েকৃজিকিউটার (কার্য্য সম্পাদক) হইবেন। পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনাদিবাবতে ঋণ থাকিলে প্রথমতঃ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় প্রেরিত দরবারের অর্থাৎ উক্ত নামধেয় প্রচারক সভার অভিমত এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দুভূষণ ও শ্রীমান বিপিনচন্দ্র সেনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উক্ত ঋণ পরিশোধাদিবিষয়ে অর্থব্যয়াদি করিবেন। ঋণপরিশোধ ও পুস্তক পুনর্মুদ্রাঙ্কনার্থ ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া অর্থ সঞ্চিত থাকিলে দরবার প্রচারকার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকা রাখিবেন, অবশিষ্ট ৭৫ পঁচাত্তোর টাকা আমার জন্মভূমি পাঁচদোনা গ্রামের দুঃখিনী বিধবা, নিরাশ্রয় বালক বালিকা, দরিদ্র বৃদ্ধ ও নিরুপায় রোগী এবং নিঃসম্বল ছাত্র ও ছাত্রীদিগের অন্নবস্ত্র চিকিৎসা ও বিদ্যা সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে। জলকষ্ট দূর ও গৃহহীন দরিদ্রদিগের গৃহাভাব মোচন করার সাহায্য সেই অর্থ দ্বারা হইতে পারিবে। কোন কোন নববিধান প্রচারক মহেশ্বরদি পরগণার কোন স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গেলে তাঁহাদের পাথেয়াদির সাহায্য সেই পুস্তকের ফাণ্ড হইতে দান করা যাইতে পারিবে। ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান ইন্দুভূষণ সেন ও শ্রীমান বিপিনচন্দ্র সেন উক্ত অর্থবিতরণ সম্বন্ধে য়েক্‌জিকিউটার নিযুক্ত হইবেন। তাঁহারা তাঁহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত অনুজগণের এবং পাঁচদোনা গ্রামস্থ আমার খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান বৈকুণ্ঠচন্দ্র সেন ও শ্রীমান প্রতাপচন্দ্র সেনের যোগে একটি কমিটি স্থাপন করিয়া সকলের পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক অধিকাংশের মতে সেই সকল কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিবেন। কোন কারণে কমিটীর মেম্বরগণ সকলে একত্রিত হইতে না পারিলে সম্পাদক পত্র লিখিয়া তাঁহাদের মত আনয়ন করিয়া

অধিকাংশের মতে কার্য্য করিবেন। প্রথমোক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একজন উক্ত কমিটীর সম্পাদক ও একজন সহকারী সম্পাদক হইবেন। কমিটি আবশ্যক বোধ করিলে সেই অর্থ দ্বারা পাঁচদোনা গ্রামের সন্নিহিত অপর গ্রাম সকলের দুঃখী দরিদ্রদিগের বিশেষ বিশেষ অভাব মোচন করিতে পারিবেন। উক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের অবর্ত্তমানে তাঁহাদিগের প্রধান উত্তরাধিকারীদিগের প্রতি যথাক্রমে এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইবে। মদচিত্ত উক্ত পুস্তক সকলের উপস্বত্ব আমি যেমন নিজের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করিতেছি না, তদ্রূপ আমার উত্তরাধিকারী ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতির ভোগাদির জন্য তাহাতে কোন স্বত্বাধিকার থাকিবে না। আমার পরিশ্রমজাত অর্থ ধর্ম্মপ্রচার ও পরসেবাতে ব্যয়িত হইবে। সময়ে আমার উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে কেহ একান্ত দারিদ্র্য অবস্থায় পড়িয়া উক্ত দান পাইবার উপযুক্ত হইলে দরবারের অভিমতে তাহারও পাইবার অধিকার থাকিবে। প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ আয়ব্যয়ের হিসাব পত্রাদি রাখা ও বাহুল্যরূপে পুস্তক বিক্রয় ও প্রচার জন্য আবশ্যক মতে স্থায়ী বা অস্থায়ী বেতনভোগী লোক নিযুক্ত করিবেন। উপযুক্ত কমিশনদানে কিংবা অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে তিনি পুস্তক বিক্রয় করিতে পারিবেন, তিনি উহার হিসাবপত্র প্রেরিত দরবারে অর্পণ করিবেন। উপরিউক্ত পুস্তকাবলীর মধ্যে কোন পুস্তকের কোন কোন অংশ পরিবর্তন ও পরিবর্জ্জন বা সংশোধন করা আবশ্যক হইলে উক্ত প্রচারক সভার মতে তাহা হইতে পারিবে। পুস্তক বিক্রয়ান্তে খরচ বাদে যাহা লাভ হইবে তাহার শতকরা ৭৫ পঁচাত্তোর টাকা প্রেরিত দরবার পাঁচদোনার উপরিউক্ত হিতকর কার্য্য সম্পাদনার্থ উক্ত অর্থবিতরণ কমিটীর হস্তে অর্পণ করিবেন। কমিটীর সম্পাদক ছয় মাস অন্তে বা বৎসরান্তে টাকা পাইবার জন্য দরবারের সম্পাদকের নিকটে পত্র লিখিবেন; ফণ্ডে পুস্তকের উপস্বত্ব থাকিলে দরবার তাহা প্রদান করিবেন। পরে কোন্ কোন্ বাবতে কত অর্থ ব্যয় হইল কমিটীর সম্পাদক দরবারকে জানাইবেন। কোন পুস্তক পুনঃর্মুদ্রাঙ্কনে অর্থের অভাব হইলে দরবার উপযুক্ত অংশদানে কোন ব্যক্তিকে বা কতিপয় ব্যক্তিকে তাহা প্রকাশের ভার অর্পণ করিতে পারিবেন। অর্থব্যয় ও বিতরণ করিবার ভার প্রাপ্ত য়েক্জি-কিউটারগণ নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে প্রথমতঃ দরবার তাঁহাদের ত্রুটির বিষয় তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিবেন, তাহাতে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট না হইলে দরবারের অভিমতে প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ আমার দেশস্থ দুই

তিন জন উপযুক্ত বিশ্বস্ত লোকের হস্তে সেই ভার অর্পণ করিতে পারিবেন। উক্ত অধ্যক্ষের নিজকার্য্যে ত্রুটি হইলে অর্থবিতরণসম্বন্ধীয় য়েক্‌জিকিউটারগণ প্রেরিত দরবারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া মীমাংসা করিয়া লইবেন। পুস্তকাদি সম্বন্ধে কোন নুতন ব্যবস্থা করা আবশ্যক বোধ করিলে তাঁহারা প্রেরিত দরবারের মত গ্রহণ করিয়া করিতে পারিবেন। প্রচারকার্য্যালয়ের বর্ত্তমান অধ্যক্ষের অবর্ত্তমানে তাঁহার স্থলবর্ত্তী যিনি হইবেন তিনিও উইল সম্বন্ধীয় প্রথমোক্ত য়েক্‌জিকিউটার হইবেন। কালক্রমে যদি দরবারের এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে যে, তাহাতে উল্লিখিত কার্য্য সকলের ব্যাঘাত হয়, বা দরবার না থাকে, কিংবা তাহার স্থলবর্ত্তী নামান্তরপ্রাপ্ত কোন প্রচারক সভার অভাব হয়, তাহা হইলে দাতব্যের জন্য নিযুক্ত গবর্ণমেন্টের বিশেষ কর্ম্মচারীর প্রতি বা অফিসিয়েল ট্রষ্টির প্রতি উক্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হইতে পারিবে। পৈতৃক সম্পত্তি ও মৎপ্রণীত পুস্তকাদি ব্যতীত অপর কোন সম্পত্তি বা অপরের রচিত পুস্তক আমার স্বত্বাধিকারে থাকিলে তাহার উপস্বত্ব পূর্ব্বোক্তরূপ দাতব্য বিভাগে ব্যয়িত হইবে।

"আমার যে সকল উর্দ্দু পুস্তক ও বক্তৃতা লাহোর ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যে সেই সমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত বলারাম ভীমবাট দ্বারা মুদ্রিত হইয়া প্রচার হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন স্বত্ব নাই, পরে আমার কোন উত্তরাধিকারীরও স্বত্ব থাকিবে না।

"প্রায় চারি বৎসর যাবৎ মহিলা নাম্নী মাসিক পত্রিকা আমার দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে, এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী দরবার, তাহার উপস্বত্বাদিতে আমার কোন স্বত্ব নাই, সুতরাং আমার উত্তরাধিকারীদিগেরও তাহাতে কোন স্বত্ব থাকিবে না।

"মুদ্রচিত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রচারভাণ্ডারভুক্ত হইয়াছে। তাহার উপস্বত্ব দ্বারা দরিদ্র প্রচারক পরিবারের ভরণ পোষণাদির সহায়তা হইবে। প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষের হস্তে সেই সকল পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন ও অর্থ আদান প্রদানাদির ভার সম্পূর্ণ ন্যস্ত আছে। সেই সমুদায় পুস্তক প্রচারভাণ্ডারের অর্থে ও কিয়দংশ অন্যদীয় সাহায্যে মুদ্রিত হইয়াছে। আমার উত্তরাধিকারীদিগের তাহাতে কোন স্বত্ব নাই ও কখনও স্বত্ব থাকিবে না। সেই সমস্ত পুস্তক আমি প্রচারভাণ্ডারের সাহায্যার্থ অর্পণ ও দান করিয়াছি। অতঃপর আমা কর্ত্তৃক রচিত হইয়া যে কোন পুস্তক প্রচারভাণ্ডারের অর্থ দ্বারা মুদ্রিত

হইবে তাহাও পূর্ব্বোক্তরূপ প্রচারভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। অপিচ আমার রচিত যে সকল পুস্তক ভবিষ্যতে প্রচারভাণ্ডারের অর্থ দ্বারা মুদ্রিত হইবে না, অথবা আমি নিজের বা অন্যের অর্থসাহায্যে মুদ্রিত করিয়া প্রচারভাণ্ডারে দান করিব না, পূর্ব্বোক্তরূপ তাহার উপস্বত্ব পাঁচদোনার জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

"আমার রচিত যে সকল পুস্তক প্রচারভাণ্ডারভুক্ত হইয়াছে তাহার তালিকা; —(১) তাপসমালা, ৬ ভাগ, (২) দেওয়ান হাফেজের বঙ্গানুবাদ প্রথমার্দ্ধ, (৩) তত্ত্বকুসুম, (৪) কোরাণের রচনাবলী, (৫) দরবেশদিগের সাধনপ্রণালী, (৬) দরবেশদিগের ক্রিয়া, (৭) দরবেশদিগের উক্তি, (৮) দরবেশী, (৯) ব্রহ্মময়ীচরিত, (১০) সতীচরিত, (১১) রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবন, (১২) ঈশা কি ঈশ্বর?

"এই উইল আমি সজ্ঞানে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বাভাবিক অবস্থায় লিখিলাম, আমার মৃত্যুর পর ইহা কার্য্যে পরিণত হইবে। ইতি সন ১৩০৬ সাল, তারিখ ৮ই বৈশাখ।" "লিখক খোদ।

সাক্ষী

"শ্রীশশিভূষণ দত্ত, হাং সাং ওয়ারি, ঢাকা।
শ্রীনলিনীভূষণ দত্ত, হাং সাং ওয়ারি, ঢাকা।
"গণেশচন্দ্র পাল, সাং কাওরাইদ, জিলা ঢাকা"

রচনা-নিদর্শন

(দাতা দয়ালু-ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১।)

১. আলীফ্ লাম্-মীম্

ইহাতে নিঃসন্দেহ, এই পুস্তকই ধর্মভীরু লোকদিগের জন্য পথ-প্রদর্শক। ২। + যাহারা অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, এবং আমি যে উপজীবিকা দিয়াছি তাহা ব্যয় করে। ৩। + এবং তোমার প্রতি ও তোমার পূর্বে যাহা অবতারণ করিয়াছি তাহা যাহারা বিশ্বাস করে ও যাহারা পরলোকে বিশ্বাস রাখে তাহারা স্বীয় প্রতিপালক কর্তৃক সুপথে আছে এবং তাহারা পরিত্রাণ লাভের যোগ্য। ৪+৫। যাহারা ঈশ্বরদ্রোহী হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে হয় ভয় প্রদর্শন কর বা না কর তাহাদের পক্ষে তুল্য, তাহারা বিশ্বাস করিবে না। ৬। ঈশ্বর তাহাদিগের অন্তঃকরণ ও কর্ণকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ও তাহাদের চক্ষুর উপর আবরণ আছে, এবং তাহাদের জন্য গুরুতর শাস্তি রহিয়াছে। ৭। (রকু ১, আয়ত ৭)

এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে এরূপ লোক আছে যে, তাহারা বলিয়া থাকে, "আমরা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস রাখি, বাস্তবিক তাহারা বিশ্বাসী নহে। ৮। তাহারা ঈশ্বরকে ও বিশ্বাসী লোকদিগকে বঞ্চনা করে, বস্তুতঃ তাহারা নিজের জীবনকে ব্যতীত বঞ্চনা করে না, এবং তাহারা বুঝিতে পারে না। ৯। তাহাদের অন্তরে রোগ আছে, পরন্তু ঈশ্বর তাহাদের রোগ প্রবল করিয়া তুলিয়াছেন, এবং তাহাদের জন্য ক্লেশজনক শাস্তি আছে, যেহেতু তাহারা অসত্য বলিতেছে। ১০। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইল, "ভূমণ্ডলে অহিতাচরণ করিও না", তাহারা বলিল, "আমরা হিতকারী ইহা বৈ নহি।" ১১। জানিও নিশ্চয় তাহারা অহিতকারী, কিন্তু তাহারা বুঝিতেছে না। ১২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইল, "লোকে যেমন বিশ্বাস করিয়াছে

তদ্রূপ তোমরাও বিশ্বাস কর।" তাহারা বলিল "নির্বোধেরা যেরূপ বিশ্বাস করিতেছে আমরা কি তদ্রূপ বিশ্বাস করিব?" জানিও নিশ্চয় তাহারাই নির্বোধ, কিন্তু বুঝিতেছে না। ১৩। এবং যখন বিশ্বাসী লোকদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তখন তাহারা বলে, "আমরা বিশ্বাসী", ও যখন নিভৃতে স্বীয় শয়তানদিগের সঙ্গে (আপন দলপতিগণের সঙ্গে) বাস করে তখন বলে, "নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গী, আমরা উপহাস করি, ইহা বই নহে।" ।১৪। ঈশ্বর তাহাদিগকে উপহাস করেন, এবং তাহাদের বিরুদ্ধাচরণে তাহাদিগকে অবকাশ দেন, তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। ১৫। ইহারাই তাহারা যাহারা সুপথের বিনিময়ে বিপথকে ক্রয় করিয়াছে, অনন্তর ইহাদের বাণিজ্যে লাভ হয় নাই ও ইহারা সুপথগামী নহে। ১৬। ইহাদের দৃষ্টান্ত যথা —কেহ অগ্নি প্রজ্বলিত করিল, পরে যখন তাহা তাহার চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত করিল, ঈশ্বর তাহা হইতে অগ্নির জ্যোতিঃ প্রত্যাহার করিলেন, এবং তাহাকে অন্ধকারে রাখিলেন, সে কিছু দেখিতে পাইল না। ১৭। তাহারা বধির, মূক, অন্ধ; অপিচ তাহারা পরিবর্তিত হয় না। ১৮। অথবা আকাশের সেই মেঘের ন্যায় যাহাতে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ আছে, তাহারা গর্জন-বশতঃ মৃত্যুভয়ে স্ব স্ব কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতেছে; ঈশ্বর ধর্মদ্রোহী-দিগের আক্রমণকারী। ১৯। সত্বরই বিদ্যুৎ তাহাদের দৃষ্টি হরণ করিবে; যখন (বিদ্যুৎ) তাহাদিগকে জ্যোতিঃ প্রদান করে তাহারা তাহাতে চলিতে থাকে, যখন তাহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন দণ্ডায়মান থাকে, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় তাহাদের চক্ষু, কর্ণ হরণ করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশীল। ২০। [র, ২, আ, ১৩]

হে লোকসকল, যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে সৃজন করিয়াছেন, তোমরা আপনাদের সেই প্রতিপালককে অর্চনা কর, তাহাতে তোমরা রক্ষা পাইবে। ২১। +যিনি তোমাদের জন্য ভূতলকে শয্যা, আকাশকে চন্দ্রাতপ করিয়াছেন, এবং আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করেন, পরে তাহা হইতে ফলপুঞ্জ তোমাদের উপজীবিকার জন্য উৎপাদন করেন, সেই ঈশ্বরকে অর্চনা কর, ঈশ্বরের সদৃশ নিরূপিত করিও না, অপিচ তোমরা জ্ঞাত আছ। ২২। আমি যাহা আপন দাসের প্রতি অবতারণ করিয়াছি, তাহাতে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে তবে তৎসদৃশ এক সুরা

উপস্থিত কর; যদি তোমরা সত্যাশ্রিত হও তবে ঈশ্বর ব্যতীত স্বীয় সাক্ষি-গণকে আহ্বান কর। ২৩। পরন্তু যদি করিলে না, তবে নিশ্চয় করিতে পারিবে না; অতএব যে অগ্নির ইন্ধন মনুষ্য, সেই নরকাগ্নি ও প্রস্তরপুঞ্জ সম্বন্ধে সাবধান হও; (তাহা) ঈশ্বরদ্রোহী লোকদিগের জন্য সঞ্চিত আছে। ২৪। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকার্য করিয়াছে তাহাদিগকে (হে মোহাম্মদ) তুমি এই সুসংবাদ দান কর যে, তাহাদের জন্য স্বর্গের উদ্যানসকল আছে, যাহার নিম্ন দিয়া পয়:প্রণালীসকল প্রবাহিত হইতেছে: যখন তাহা হইতে ফলপুঞ্জ উপজীবিকারূপে তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে তখন তাহারা বলিবে, আমাদিগকে পূর্বে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে ইহা সেই ফল; আকারে পরস্পর সাদৃশ্য গৃহীত হইবে, এবং সেখানে তাহাদের জন্য পুণ্যবতী ভার্যাসকল থাকিবে ও তাহারা তথায় নিত্যকাল বসবাস করিবে। ২৫। নিশ্চয় ঈশ্বর মশকের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবের উদাহরণ দিতে লজ্জিত হন না, কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী তাহারা জানে যে, তাহাদের প্রতি-পালকের এই (রূপ দৃষ্টান্ত) সত্য; কিন্তু ঈশ্বরদ্রোহী লোকেরা পরে বলে "এই উদাহরণে ঈশ্বর কি অভিপ্রায় করেন?" ইহা দ্বারা তিনি অনেককে পথচ্যুত ও অনেককে পথ প্রদর্শন করিতেছেন; এতদ্বারা কুক্রিয়াশীল লোক ব্যতীত অন্যে পথচ্যুত হয় না। ২৬। যাহারা ঈশ্বরের অঙ্গীকার তাহা বন্ধনের পর ভঙ্গ করে, এবং ঈশ্বর সম্মিলন বিষয়ে যে আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা লঙ্ঘন করে, এবং পৃথিবীতে অহিতাচরণ করে, ইহারাই তাহারা যে ক্ষতিগ্রস্ত। ২৭। কেমন করিয়া তোমরা ঈশ্বরদ্রোহী হও; অবস্থা ত এই — তোমরা নির্জীব ছিলে পরে তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিয়াছেন, অত:পর তিনি তোমাদিগকে সংহার করিবেন, ইহার পর তিনি জীবন দান করিবেন; অবশেষে তাঁহার দিকেই তোমাদের প্রতিগমন। ২৮। তিনি সেই, যিনি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় তোমাদিগের জন্য সৃজন করিয়াছেন, তৎপর নভোমণ্ডলের প্রতি মনোযোগী হইয়া সপ্ত স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞানী। ২৯। (র, ৩, আ, ৯) [কোরআন শরীফ]

আরব দেশের অন্তর্গত কুফা নগরের অনতিদূরে ফোরাত নদীর পূর্ব-কূলে বাবেল নামে এক মহাসমৃদ্ধ নগর ছিল। এই নগর নোম্রুদ নামক ঈশ্বরদ্রোহী দুর্দান্ত রাজার রাজধানী ছিল। "আমিই পরমেশ্বর, আমাকে

পূজা অর্চনা করিতে হইবে।" নোম্‌রুদ স্বীয় রাজ্যমধ্যে এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিল। তখন প্রজামণ্ডলী তাহাকেই ঈশ্বরপদে বরণ করিয়া পূজা করিতে বাধ্য হয়, সকলেই স্ব স্ব গৃহে ও সাধারণ মন্দিরে নোম্‌রুদের প্রতিমূর্ত্তি পূজার জন্য প্রতিষ্ঠিত করে। স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবা সকল লোকেই নোম্‌রুদ প্রধান ঈশ্বর বিশ্বাস করে ও তাহার একান্ত অনুগত ভক্ত হইয়া তাহার সেবায় ও আজ্ঞাপালনে রত থাকে। চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদির পূজা ও অপর কোন কোন দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজাও তখন সে দেশে প্রচলিত ছিল। একদা নোম্‌রুদ এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া ভীত হয়, এবং প্রধান প্রধান জ্যোতির্বিবৎ পণ্ডিতগণকে ডাকিয়া আনিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন ও তাহার শুভাশুভ ফলাফল ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করে। নোমরুদ স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে, আকাশমার্গে অতিশয় উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র উদিত হইয়া আপন জ্যোতিতে চন্দ্রসূর্য্যের জ্যোতিকে পরাস্ত করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, নোমরুদ এরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিল, একটি প্রকাণ্ড হরিণ আসিয়া তাহার সিংহাসনে শৃঙ্গাঘাত করে, তাহাতে সিংহাসন ভগ্ন হইয়া যায়। যাহা হউক স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর সুবিজ্ঞ জ্যোতির্বিদগণ সূক্ষ্মরূপে গণনা করিয়া নিবেদন করিল যে, "মহারাজ, গ্রহনক্ষত্রাদির সম্বন্ধে ও গতি পর্য্যালোচনায় অবগতি হইল যে, অচিরে আপনার রাজ্যে অতিশয় বিপ্লব উপস্থিত হইবে। বর্ত্তমান বর্ষে এক মহা তেজস্বী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই সেই বিপ্লবের কারণ হইবেন, তিনি মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবেন। সেই মহাপুরুষ প্রতিমাপূজার মূল উৎপাটন করিয়া জগতে নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাঁহার অভ্যুদয়ে রাজত্বের মূল কম্পিত ও রাজবংশ বিলুপ্ত হইবে।" তখন খলিদ নামক প্রধান জ্যোতির্বিদ রাজাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিল যে, "এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে তাহার প্রতি-বিধানের চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। সুযুক্তি এই যে, রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রহরিরূপে, কতকগুলি লোক নিযুক্ত করা যাউক, কোন পুরুষকে স্ত্রীসঙ্গ করিতে না দেওয়া তাহাদের কার্য্য হইবে। যে সকল নারী এক্ষণ গর্ভবতী আছে, তাহাদের কাহারও পুত্র সন্তান প্রসূত হইলে প্রহরিগণ তৎক্ষণাৎ সেই শিশুকে হত্যা করিবে।" ভয়াকুল নির্দ্দয় নোমরুদের নিকটে এই পরামর্শ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বোধ হইল। নোমরুদ অনন্যোপায় হইয়া আত্মজীবন ও রাজ্য সম্পদ রক্ষার জন্য তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিল

বাবেল নগরে একজন সুনিপুণ প্রতিমানির্ম্মাতা ছিলেন, তাঁহার নাম তেরখ, তাঁহার অপর নাম আজর, তিনি রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। নোমরুদ তাঁহার প্রতি প্রহরী নিযুক্ত করা আবশ্যক বোধ করে নাই বরং তাঁহাকে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত করিল। গর্ভবতী নারীদিগের প্রতি শত শত স্ত্রীলোক প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা সর্ব্বদা গৃহে গৃহে যাইয়া অনুসন্ধান লইত। কাহারও পুত্রসন্তান হইয়াছে জানিবামাত্র সেই শিশুটিকে কালভবনে প্রেরণ করিত। কথিত আছে এই নিষ্ঠুর হত্যা-কাণ্ডে প্রায় লক্ষ লক্ষ শিশুর প্রাণ নাশ হয়। তেরখের পত্নীর নাম আদনা। তিনি একদিন রজনীতে গোপনে আসিয়া স্বামীর সঙ্গে সম্মিলিত হন, তাহাতে তাঁহার গর্ভের সঞ্চার হয়। এই গর্ভেই মহাপুরুষ এব্রাহিম জন্ম-গ্রহণ করেন। যে রাত্রিতে আদনা গর্ভবতী হন তাহার পরদিন ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ আপনি যে বালকের জন্য চিন্তিত আছেন ও যাহার বিনাশসাধনে যত্ন করিতেছেন সে গত রজনীতে গর্ভস্থ হইয়াছে।" নোমরুদ ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল গর্ভপরীক্ষা ও শিশুহত্যা বিষয়ে অতিশয় দৃঢ়তা প্রকাশ কবিতে লাগিল, চেষ্টা যত্নের একশেষ হইল।

[মহাপুরুষচরিত: ১ম ভাগ]

তাপসী রাবেয়া ঈশ্বরপ্রেমের অন্তঃপুরে বৈরাগ্যযবনিকার অন্তরালে বাস করিতেন। তিনি পরম বিশ্বাসিনী ঈশ্বরানুরক্তা রমণী ছিলেন। যদি বল, "পুরুষের শ্রেণীতে নারীকে কেন স্থান দান করা হইল?" উত্তর এই মহাপুরুষ মোহাম্মদ বলিয়াছেন, "সত্যই ঈশ্বর তোমাদের বাহ্য আকৃতি দর্শন করেন না, তোমাদের মন ও সঙ্কল্প দেখেন।" বাস্তবিক আকৃতি কিছুই নহে ধর্মনিষ্ঠাই সার। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন "মনুষ্য মানসিক সদসদবস্থানুসারে পারলৌকিক শুভাশুভ ফল লাভ করিবে।" প্রেরিত মহা-পুরুষের সহধর্ম্মিণী আয়েশা হইতে যেমন ধর্ম্মশিক্ষা করা বিধেয় তাঁহার দাসীগণ হইতেও ধর্ম্মবিষয়ে উপকার লাভ করা উচিত। ধর্ম্মপথে যখন কোন অবলা বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তখন তাঁহাকে অবলা বলা যায় না। যথা কোন মহাত্মা বলিয়াছেন "পারলৌকিক বিচারের দিন যখন পুরুষদিগকে আহ্বান করা হইবে তখন পুরুষের শ্রেণীতে ঈশ্বর জননী মেরি পদ স্থাপন

করিবেন।" যখন মহর্ষি হোসেন বসোরী সভায় তাপসী রাবেয়াকে উপস্থিত না দেখিলে ধর্ম্মালোচনা করিতেন না, তখন তাঁহার প্রসঙ্গ তাপসদিগের প্রসঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত করা অযুক্ত নহে। কথা এই অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সঙ্গে প্রাণের যোগ-সম্বন্ধে এই সকল লোকের সম্পর্ক, পুরুষ বা স্ত্রী ইহাতে কি আইসে যায়? রাবেয়ার সময়ে তাঁহার তুল্য উচ্চ ধর্ম্ম ভাব অন্য কাহার ছিল না। তিনি মহাজনদিগের অগ্রগণ্যা ছিলেন।

রাবেয়া তুরস্কদেশের অন্তর্গত বাসোরা নগরনিবাসী এক জন দরিদ্রের কন্যা ছিলেন। অরবী ভাষায় রাবা শব্দে চতুর্থ বুঝায়। তিনি সেই দরিদ্রের চতুর্থ কন্যা ছিলেন বলিয়া রাবেয়া নামে আখ্যাতা হন। রাবেয়া বয়:প্রাপ্ত হইলে তাঁহার জনক জননী উভয়েই লোকান্তর গমন করেন। তাঁহাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বসোরাতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তখন ভগিনীগণ হইতে রাবেয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এক দুর্বৃত্ত তাঁহাকে অসহায় পাইয়া কয়েকটী তাম্র মুদ্রার বিনিময়ে একজন সম্পন্ন লোকের হস্তে সমর্পণ করে। সে ব্যক্তি দাসীরূপে রাবেয়াকে ক্রয় করিয়া স্বীয় পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত রাখে। সে অতিশয় নিষ্ঠুর প্রকৃতি লোক ছিল, রাবেয়াকে সাধ্যাতীত পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত করিত, তিনি কোনরূপে তাহা সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। অনেক সময় তাঁহাকে বিষম নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত। এক দিন আর ক্লেশ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি প্রভুর আলয় হইতে পলাইয়া যান। ত্রস্তে ব্যস্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিয়া যাইতে পথে আছাড় খাইয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তখন নানা ক্লেশ ও বিপদে চতুর্দিক অন্ধকার দেখিয়া ভূমিতলে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিলেন "হে পরমেশ্বর, আমি পিতৃ মাতৃহীনা দু:খিনী বন্দিনী হইয়া আছি হস্ত ভঙ্গ হইয়া গেল, এই সকল দুরবস্থাতেও আমার শোক নাই আমি তোমার প্রসন্নতা চাই, বল প্রভো, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন কি না?" তখন এই স্বর্গীয় বাণী রাবেয়া শুনিতে পাইলেন "বৎসে শোক করিও না, অচিরে তোমার গৌরবর্দ্ধন হইবে, দেবগণ তোমাকে আদর করিবেন।" রাবেয়া ইহাতে সান্ত্বনা পাইয়া প্রভুর গৃহে ফিরিয়া আইসেন। তদবধি দিবাভাগ গৃহস্বামীর পরিচর্য্যায় ও রজনী ধর্ম্মপুস্তকের শ্লোক পাঠে ও উপাসনায় যাপন করিতে লাগিল।

[তাপসমালা : ১ম ভাগ]

যাহার অন্তরে ঈশ্বরে প্রেম প্রবল হইয়া মত্ততায় পরিণত হইয়াছে, তাহার জন্য সঙ্গীত প্রয়োজন। সঙ্গীতযোগে সুফীদিগের কাহারও কাহারও অন্তরে যেরূপ গূঢ় ধর্মীয় ভাব প্রকাশিত হয়, হৃদয় কোমলতা লাভ করে, অন্য কিছুতেই সেরূপ হয় না। সুফীগণ সঙ্গীতের প্রভাবে যে স্বর্গীয় প্রেমার্দ্র ভাব প্রাপ্ত হন, তাহাকে তাঁহারা 'ওজ্দ' (ভাবাবেশ) বলেন। আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে আত্মার যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, সঙ্গীত সেই সম্বন্ধে এতদূর জীবন্ত করিয়া তোলে যে আত্মা ইহলোক হইতে একেবারে প্রস্থান করে। সঙ্গীতের এইরূপ ভাবাদর্শন করিয়া যাঁহারা তাহাতে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করেন, তাঁহাদেরও তৎপ্রভাবে অনেক উপকার হয়।

[ধর্ম্মসাধননীতি: ২য় ভাগ]

অন্য লোকে সত্য জানিয়া অধিক মূল্য দিয়া কিনিবে এই উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে দর চড়াইয়া কোনও দ্রব্য লওয়া নিষেধ। যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে প্রতারণা করিবার জন্য বিক্রেতার দ্বারা এইরূপ ব্যবহার ঠিক করিয়া লয়, তবে যখন তাহার গূঢ় কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তখনই সেই বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে। এরূপ রীতি আছে যে, বাজারে মাল রাখিয়া দেওয়া হয়, প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি ক্রয় করিবে না সে তাহার দর বাড়াইয়া দেয় এ প্রকার করা পাপ। যে অচতুর বিক্রেতা দ্রব্যের মূল্য জানে না, সস্তা বিক্রী করে, তাহা হইতে জিনিস কেনা অনুচিত; এবং যে ভোলা প্রকৃতি ক্রেতা দর জানে না, অধিক দরে জিনিস কেনে তাহার হস্তে বিক্রী করা অন্যায়।

[নীতিমালা: ১ম ভাগ]

কোন ব্যক্তি আপন মুখে নিজের মূর্খতা স্বীকার করে না কিন্তু যে অন্যের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই কথা বলিতে আরম্ভ করে, তাহা দ্বারাই তাহার মূর্খতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। একজনে কথা বলিতেছে, এমন সময় তুমি কথা বলিতে আরম্ভ করিও না। বিবেচক সতর্ক লোকেরা অন্য বক্তাকে নীরব না দেখিলে কথায় প্রবৃত্ত হয় না।

[হিতোপাখ্যানমালা: ১ম ভাগ]

তথ্য-নির্দেশ

১. গিরিশচন্দ্রের জন্মের সঠিক সাল-তারিখ নির্ণয় আজ প্রায় অসম্ভব। তাঁর 'আত্মজীবন' (১৩১৩) গ্রন্থে বলেছেন তিনি: "এই ১৩১৩ সালে আমার বয়ঃক্রম ৭১ বা ৭২ বৎসর হইয়া থাকিবে। বহুকাল হইল আমার জন্মপত্রিকা হারাইয়া গিয়াছে, আমি নিজের বয়স নিশ্চিত রূপে বলিতে পারিনা। তবে ইহা নিশ্চয় ৭০ অতীত হইয়াছে।" (পৃ: ১)। ইসলাম-প্রচারক মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীন তাঁর এক প্রবন্ধে ('ইসলাম-প্রচারক': নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০১; পৃ: ১৮৬) গিরিশচন্দ্রের বয়সের যে হিসেব দিয়েছেন তাতে তাঁর জন্মসাল হয় ১৮৩৮। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'নব্যভারত' (আষাঢ় ১৩১৮; পৃ: ১৮৫) পত্রিকায় যে নিবন্ধ প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয়: "সম্ভবত ১২৪২ সালের বৈশাখ মাসে জন্ম, তারিখ অজ্ঞাত ···।" বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'ভারতকোষে' (পৌষ ১৩৭৪: ৩য় খণ্ড; পৃ ১৩৮) গিরিশ-চন্দ্রের জন্ম অনুমান করা হয়েছে ১৮৩৫ সাল। আবার 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধানে' (কলিকাতা, মে ১৯৭৬; পৃ: ১২৫) ১৮৩৫/৩৬ সাল তাঁর জন্মকাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. কাজী মোতাহার হোসেন: "ভাই গিরিশচন্দ্র সেন"। জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা প্রকাশিত 'কয়েকটি জীবন': ঢাকা, তারিখ নেই, পৃ: ৭৮

৩. গিরিশচন্দ্র সেন: 'আত্মজীবন'। কলিকাতা, ১৩১৩; পৃ: ২

৪. ঐ; পৃ: ২—৩

৫. ঐ; পৃ: ৭

৬. ঐ; পৃ: ৬

৭. ঐ; পৃ: ৩

৮. ঐ; পৃ: ৮৯

৯. ঐ; পৃ: ১—২

১০. ঐ; পৃঃ ৭
১১. ঐ; পৃঃ ৮
১২. ঐ; পৃঃ ১৫
১৩. ঐ; পৃঃ ১৬
১৪. ঐ; পৃঃ ১২
১৫. গিরিশচন্দ্র সেন অনূদিত : 'কোরআন শরীফ'। হরফ প্রকাশনী সংস্করণ : কলিকাতা, ১ বৈশাখ ১৩৮৬। সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় : "মৌলবী ভাই গিরিশচন্দ্র সেন"; পৃঃ ১৫
১৬. গিরিশচন্দ্র সেন : 'আত্মজীবন'। পূর্বোক্ত; পৃঃ ৩০
১৭. ঐ; পৃঃ ৩৫—৩৬
১৮. ঐ; পৃঃ ৪৭
১৯. ঐ; পৃঃ ১৪
২০. ঐ; পৃঃ ১৪
২১. ঐ; পৃঃ ১৯
২২. ঐ; পৃঃ ১৬—১৭
২৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাময়িক-পত্র' (২য় খণ্ড)। দ্বি-সঃ কলিকাতা, আষাঢ় ১৩৫৯; পৃঃ ৪
২৪. গিরিশচন্দ্র সেন : 'আত্মজীবন'। পূর্বোক্ত; পৃঃ ৫১—৫২
২৫. সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত; পৃঃ ২০
২৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত; পৃঃ ৭০
২৭. গিরিশচন্দ্র সেন : 'আত্মজীবন'। পূর্বোক্ত; পৃঃ ১৯
২৮. সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত; পৃঃ ২০
২৯. গিরিশচন্দ্র সেন : 'আত্মজীবন'। পূর্বোক্ত; পৃঃ ১৯
৩০. সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত; ১৯
৩১. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (প্রধান সম্পাদক) : 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান'। কলিকাতা, মে ১৯৭৬; পৃঃ ১২৫
৩২. গিরিশচন্দ্র সেন : 'আত্মজীবন'। পূর্বোক্ত; পৃঃ ৬১
৩৩. ঐ; পৃঃ ১৭—১৮
৩৪. ঐ; পৃঃ ১৮
৩৫. ঐ; পৃঃ ১২

৩৬. ঐ; পৃ: ১৩
৩৭. ঐ; পৃ: ৫০
৩৮. ঐ; পৃ: ৪৩
৩৯. ঐ; পৃ: ১৪৬
৪০. সতীকুমার চট্টোপাধ্যায: পূর্বোক্ত; পৃ: ২০
৪১. ঐ; পৃ: ২০
৪২. ঐ; পৃ: ২০
৪৩. "অমর গ্রন্থকার গিরিশচন্দ্র সেন"। 'নব্যভারত': আষাঢ় ১৩১৮; পৃ: ১৮৫
৪৪. গিরিশচন্দ্র সেন: 'আত্মজীবন'। পূর্বোক্ত; পৃ: ৯৮
৪৫. সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়: পূর্বোক্ত; ২০-২১
৪৬. সতীশচন্দ্র সেন: "স্বর্গগত প্রচারক গিরিশচন্দ্র সেন"। 'নব্যভারত': ভাদ্র ১৩১৭; পৃ: ২৮৩
৪৭. সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়: পূর্বোক্ত; পৃ: ২১
৪৮. "অমর গ্রন্থকার গিরিশচন্দ্র সেন"। 'নব্যভারত': আষাঢ় ১৩১৮; পৃ: ১৯০
৪৯. গিরিশচন্দ্র সেন: 'আত্মজীবন'। পূর্বোক্ত; পৃ: ১৫
৫০. ঐ; পৃ: ১৬
৫১. ঐ; পৃ: ১১৮
৫২. ঐ; পৃ: ৯২—৯৩
৫৩. ঐ; পৃ: ৬৮
৫৪. ঐ; পৃ: ৯১-৯২
৫৫. ঐ; পৃ: ৭৪-৭৫
৫৬. সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়: পূর্বোক্ত; পৃ: ২৪
৫৭. ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের গ্রন্থের তালিকা-প্রস্তুতের জন্যে আলী আহমদের 'মুসলিম বাংলা গ্রন্থপঞ্জী' (ঢাকা, ৩ ডিসেম্বর ১৯৮৫), সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'মৌলিবী ভাই গিরিশচন্দ্র সেন' নামক প্রবন্ধ ও গিরিশ-চন্দ্র সেনের 'আত্ম-জীবন' (১৩১৩) গ্রন্থ থেকে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের বেশ কয়েকটি বই অনুগ্রহ করে ব্যবহার

করতে দিয়েছেন শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের পুত্র অবসরপ্রাপ্ত জেলা সব-রেজিষ্ট্রার জনাব এম. আশরাফ-উল হক, তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ও ঋণী। গিরিশচন্দ্র অনূদিত দ্বিতীয় সংস্করণের একখণ্ড 'কোরআন শরীফ' পেয়েছি মেহেরপুর জেলার গাঁড়াডোব গ্রামের জনাব খন্দকার মহসীন আলীর সৌজন্যে। গিরিশচন্দ্রের 'আত্ম-জীবন' বইখানা পেয়েছিলাম প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের নিকট থেকে।

৫৮. গিরিশচন্দ্র সেন: 'আত্ম-জীবন'। পূর্বোক্ত; পৃ: ১৩২-৩৫
৫৯. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার: 'আশীষ'। 'আত্মকথা' (৪র্থ খণ্ড)-এ সংকলিত। অনন্য প্রকাশন, কলিকাতা, জানুয়ারী ১৯৮৬; পৃ: ৪৪
৬০. ঐ; পৃ: ১৪১
৬১. ঐ; পৃ: ১২০
৬২. ঐ; পৃ: ১৩৭
৬৩. ঐ; পৃ: ১৩৮
৬৪. ঐ; পৃ: ১২৫--২৬
৬৫. ঐ; পৃ: ১৪৬
৬৬. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য: আবুল আহসান চৌধুরীর প্রবন্ধ "বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও ভাই গিরীশচন্দ্র সেন"। 'কাশবন' (ত্রৈমাসিক, আমিনুল ইসলাম সম্পাদিত): ঢাকা, জানুয়ারী-- মার্চ ১৯৭৮; পৃ: ২০--২৭
৬৭. গিরিশচন্দ্র সেন: 'আত্ম-জীবন'। পূর্বোক্ত; পৃ: ১১৯--২০
৬৮. ঐ; পৃ: ১৩১
৬৯. ঐ; পৃ: ১৪০
৭০. ঐ; পৃ: ১৪৬
৭১. ঐ; পৃ: ৫০
৭২. ঐ; পৃ: ১৩৯
৭৩. ঐ; পৃ: ১৪৩
৭৪. ঐ; পৃ: ১৪৫
৭৫. ঐ; পৃ: ১৩১

৭৬. ঐ; পৃ: ৪--৫
৭৭. ঐ; পৃ: ২১--২২
৭৮. ঐ; পৃ: ২২
৭৯. ঐ; পৃ: ৪৭
৮০. ঐ; পৃ: ৭৩
৮১. ঐ; পৃ: ৭৪
৮২. ঐ; পৃ: ৭৭
৮৩. ঐ; পৃ: ৭৮
৮৪. ঐ; পৃ: ৯৬
৮৫. ঐ; পৃ: ১১৮
৮৬. ঐ; পৃ: ৯২
৮৭. ঐ; পৃ: ৯৩
৮৮. সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়: পূর্বোক্ত পৃ: ১৮
৮৯. গিরিশচন্দ্র সেন: 'আত্ম-জীবন'। পূর্বোক্ত; পৃ: ১০৪
৯০. ঐ; পৃ: ১১২--১৩
৯১. ঐ; পৃ: ১১১
৯২. "অমর গ্রন্থকার গিরিশচন্দ্র সেন"। 'নব্যভারত': আষাঢ় ১৩১৮; পৃ: ১৯০
৯৩. গিরিশচন্দ্র সেন: 'আত্ম-জীবন'। পূর্বোক্ত; পৃ: ৯৪
৯৪. গিরিশচন্দ্র সেন অনূদিত: 'কোরআন শরীফ'। হরফ প্রকাশনী, পূর্বোক্ত; পৃ: পরিশিষ্ট
৯৫. ঐ: কলিকাতা, ১২৯৮; পৃ: পরিশিষ্ট
৯৬. ঐ: পৃ: পরিশিষ্ট
৯৭. 'আত্ম-জীবন': পূর্বোক্ত: পৃ: ৯৪
৯৮. শেখ জমীরউদ্দীন: পূর্বোক্ত; পৃ: ১৮৭
৯৯. ঐ; পৃ: ১৮৮ (পাদটীকা)
১০০. গিরিশচন্দ্র সেন: 'আত্মজীবন'। পূর্বোক্ত; পৃ: ৫০--৫১
১০১. 'কোরআন শরীফ',: হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা। পূর্বোক্ত; পৃ: ১৪
১০২. ইবরাহিম খাঁ: 'বাতায়ন'। ঢাকা, আষাঢ় ১৩৭৪; পৃ: ২৮০
১০৩. 'আত্ম-জীবন': পূর্বোক্ত; পৃ: ৯৩

১০৪. মধু মিয়া: 'শান্তি-কর্তা বা হজরত মোহাম্মদ' (১ম খণ্ড)। কলি-
কাতা, ১৩১৮; পৃ: ⁄০ (ভূমিকা)
১০৫. মুহম্মদ ইসরাইল: "গিরীশবাবুর বঙ্গানুবাদে ভ্রম"। 'আহলে হাদীস,:
অক্টোবর ১৯২০: পৃ: ৯
১০৬. "অমর গ্রন্থকার গিরিশচন্দ্র সেন"। 'নব্যভারত': আষাঢ় ১৩১৮;
পৃ: ১৮৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

আলী আহমদ	বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী ঢাকা, ৩ ডিসেম্বর ১৯৮৫।
ইব্রাহিম খাঁ	বাতায়ন। ঢাকা, আষাঢ়, ১৩৭৪।
গিরিশচন্দ্র সেন	আত্ম-জীবন। কলিকাতা, ১৩১৩।
	কোরআন শরীফ। দ্বি-সঃ কলিকাতা, ১২৯৮।
	কোরআন শরীফ। হরফ--প্রকাশনী-সঃ কলিকাতা, ১ বৈশাখ ১৩৮৬।
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	আশীষ। 'আত্মকথা' (৪র্থ খন্ড)-এ সংকলিত। কলিকাতা, জানুয়ারী ১৯৮৬।
বঙ্কুবিহারী কর	পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত। কলিকাতা, ১৯৫১।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা সাময়িক-পত্র (২য় খন্ড)। দ্বি-সঃ কলিকাতা, আষাঢ় ১৩৫৯।
মধু মিয়া	শান্তি-কর্ত্তা বা হজরত মোহাম্মদ (১মখণ্ড)। কলিকাতা, ১৩১৮।
মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)। প-সঃ ঢাকা, চৈত্র ১৩৮৫।
মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন	বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা। অখণ্ড তৃ-সঃ ঢাকা ১৯৮১।

সুকুমার সেন	বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)। ব-সঃ কলিকাতা; ১৩৭৭।
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (প্রধান সম্পাদক)	সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান। কলিকাতা, মে, ১৯৭৬।
	কয়েকটি জীবন। প্রকাশক: জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান। প্রকাশকালের উল্লেখ নেই।
	ভারতকোষ (৩য় খণ্ড)। প্রকাশক: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা। পৌষ, ১৩৭৪।

পত্র-পত্রিকা

আহলে হাদীস (কলিকাতা): ১৯২০
ইসলাম-প্রচারক (কলিকাতা): ১৯০১
কাশবন (ঢাকা): ১৯৭৮
নব্যভারত (কলিকাতা): ১৩১৭—১৮